বাড়ি থেকে পালিয়েছি

শিবরাম চক্রবর্তী

কুন্ডু ব্যাক্তিগত পাঠাগার

www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

আমার কথা

বাংলা বইয়ের স্বর্ণখনি আমার সংগ্রহে আছে। যে বইগুলো আমার পছন্দ এবং ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো নতুন করে স্ক্যান না করে পুরনোগুলো বা এডিট করে নতুন ভাবে দেবো। যেগুলো পাওয়া যাবেনা, সেগুলো স্ক্যান করে উপহার দেবো। আমার উদ্দেশ্য ব্যবসায়িক নয়। শুধুই বৃহত্তর পাঠকের কাছে বই পড়ার অভ্যেস ধরে রাখা। আমার অগ্রণী বইয়ের সাইট সৃষ্টিকর্তাদের অগ্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাদের বই আমি শেয়ার করব। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বন্ধু অপ্টিমাস প্রাইম ও পি. ব্যান্ডস কে - যারা আমাকে এডিট করা নানা ভাবে শিখিয়েছেন। আমাদের আর একটি প্রয়াস পুরোনো বিস্মৃত পত্রিকা নতুন ভাবে ফিরিয়ে আনা। আগ্রহীরা দেখতে পারেন www.dhulokhela.blogspot.in সাইটটি।

আপনাদের কাছে যদি এমন কোনো বইয়ের কপি থাকে এবং তা শেয়ার করতে চান - যোগাযোগ করুন -

subhajit819@gmail.com.

PDF বই কখনই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না। যদি এই বইটি আপনার ভালো লেগে থাকে, এবং বাজারে হার্ড কপি পাওয়া যায় - তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল। হার্ড কপি হাতে নেওয়ার মজা, সুবিধে আমরা মানি। PDF করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষণ এবং দূর দূরান্তের সকল পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

There is no wealth like knowledge, No poverty like ignorance

SUBHAJIT KUNDU

বাড়ি থেকে পালিয়ের পর

বাড়ি থেকে পালিয়ে কলকাতা। অবাক-করা কাণ্ড যত কাঞ্চনের। তারপর কলকাতার থেকে ফিরে ফের আবার মায়ের কোল।

বাড়ি ফেরার পরদিন বই বগলে ইস্কুলে যেতেই ক্লাসের ছেলেরা ছেঁকে ধরল কাঞ্চনকে।

'বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছলিস কোথায় রে?'

'কোথায় ছিলিস ভাই অ্যাদ্দিন?'

'ছিলিস ইলিশমাছের দেশে।' বলল তাদের কাঞ্চন ঃ 'ইলিশমাছ খেয়েছিস কখনও?'

'খাব কি, চোখেই দেখিনি কোনও কালে—চাখব কি!' জবাব দিল একজনা।

'ইলিশমাছ কি আমাদের বাজারে আসে নাকি?'

'আমাদের গাঁয়ের নদীতে ওঠেই না।' বলল আরেক জনা ঃ 'ইলিশমাছ খালি গঙ্গায় মেলে। পদ্মাতেও পাওয়া যায় বলে থাকে।'

'পদ্মা পেরিয়ে তোর মামারবাড়ি গেছলিস বুঝি ভাই?' শুধাল তার এক বন্ধু ঃ 'ইলিশ খেতেই ভাই?'

'না, মামারবাড়ি যাইনি ভাই! গেছলাম আমি কলকাতায়।'

'ক-ল-কা-তা-য়!' বিস্ময়ে সবার চোখ বড় বড় ঃ 'কলকাতা! সে যে এখানে নয় রে! সে যে এখেন থেকে অনেক—অনেক দূর!'

'দূরই তো! সাতসমুদ্দুর তেরোনদী পার...তেপান্তর পেরিয়ে..... স্বপ্নের দেশ কলকাতা। রূপকথার পুরী সেই দেশ!' কাঞ্চনের স্বপ্নালু চোখ আবেশময় হয়ে আসে।

'সেখানেও তোর আরেক মামার বাড়ি আছে বুঝি?'

'না রে, মামারবাড়ি নয়! বাড়ি থেকেই যদি পালালুম তবে আবার কারও বাড়িতে যাব কেন? বললাম না গেছলাম কলকাতায়।'

'থাকতিস কোথায় সেখানে?'

'রাস্তায় রাস্তায়। কোথায় আবার! দিন রাত পথে-বিপথে ঘুরে বেড়াতাম খালি।'

'ঘুরে বেড়াতিস রাস্তায়? ঘুম পেলে শুতিস কোথায় শুনি?'

'যেখানে সেখানে। যত্রতত্র। যেখানে ঘুম পেতো সেখানেই শুয়ে পড়তাম সটান। রাস্তায়, ফুটপাথে, পার্কে—যেখানে খুশি আমার।'

'বলিস কি রে!' তারা হতবাক, 'খারাপ লাগত না তোর?'

'টেরই পেতাম না—খারাপ লাগবে কেন? শোবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়তাম যে! আর, এক ঘুমে রাত কাবার! ফাঁকা হাওয়ায় কী খাসা ঘুম হত যে ভাই রে! কী বলব তোদের! কত লোক যে শুয়ে থাকে সেখানকার ফুটপাথে! সারি সারি শুয়ে থাকে সব। ইঁট মাথায় শুয়ে থাকে সবাই।'

'শুলি না হয় রাস্তায়, খেতিস কি শুনি?'

'খেতিস কোথায়?'

'পাইস হোটেলে। পাইস হোটেল কাকে বলে জানিস তোরা?'

'না তো।'

'যাইনি কলকাতায় তো জানব কি!'

'পাইস হোটেল মানে নগদ পয়সা দিয়ে খাবার হোটেল। পয়সা ফেলো খাও। ইলিশমাছের সোয়াদ তো পেলাম সেইখানেই রে। ইলিশমাছকে কত রকম করে রাঁধে যে! একটা টাকা সঙ্গে ছিল আমার—এক টাকায় অনেক রকম খাওয়া গেল। একদিনেই খেলাম সব। দশ রকমের খানা ওই একদিনই খেয়েছিলাম খালি!'

'মোট্টে একদিন?'

'বললাম না, পয়সা ফেলে খেতে হয়। সমস্ত নগদ। ধারে দেয় না একদম। এ কী আমাদের গাঁয়ের বাণিজ্যের দোকানের রসগোল্লা যে তোকে ধারে খেতে দেবে এনতার—আর তোর বাবা এসে সেই ধার মেটাবে। সেখানে বাবা কোথায় রে! কেউ কারও বাবাকে চেনে নাকি? তাই, ধারে যেখানে খেতে দেয় না তেমন বাজে হোটেলের ধারে কাছে দ্বিতীয় দিন আমি যাই আবার?'

'বাকি দিনগুলো খেলি কোথায়?'

'বিয়েবাড়িতে।'

'খালি বিয়েবাড়ি খেয়েই দিন কাটালি?'

'একটা নাকি বিয়ে রে! হরদম বিয়ে হচ্ছে। একসঙ্গে দু দুটো করে বিয়ে—এক নাগাড়ে। এক বাড়িতেই আবার।'

'বলিস কী রে? প্রত্যেক বাড়িতেই দুটো করে বিয়ে? বলিস কী?'

'হবে না? দুজনের করে বিয়ে যে একসঙ্গে। ছেলের সঙ্গে মেয়ের। আর মেয়ের সঙ্গে ছেলের। লেগেই রয়েছে কলকাতায়। কত বড় শহর! কত যে রাস্তা, গলি ঘুঁজি! রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতাম তো। প্রায়ই দেখতাম বিয়ের শোভাযাত্রা যাচ্ছে ভ্যাঁপো ভ্যাঁপো ব্যাণ্ড বাজিয়ে। তার একটা না একটায় ভিড়ে যাও, কেউ তোমায় লক্ষই করবে না। তারপর বরযাত্রীর ভিড়ে মিশে গিয়ে ঢুকে পড়গে বিয়েবাড়িতে। আর পাতা পড়লেই বসে পড় গিয়ে। কত রকম যে খাবার দেয় ভাই বলাই যায় না!'

'আহা!' শুনেই কয়েকটা ছেলের লাল গড়িয়ে পড়ে।

'আবার ফাঁক পেলেই ফের চলে যাব কলকাতায়!' জিভের জল সুরুৎ করে টেনে নিয়ে কাঞ্চন তাদের জানায়।

'তোর কথায় মনে হচ্ছে কলকাতা ভারী মজার জায়গা ভাই!'

'ভারী মজার। সেখানে কেউ কারও ধার ধারে না। কেউ চেনে না কারুক্ষে। অথচ সবাই যেন সবার কত কালের চেনা। নেহাত পরও এক মিনিটে এমন আপনার হয়ে যায় যে!'

এমন সময় ক্লাস টিচার এসে পড়ায় সবাই নিজের নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। সার বসবার পর সারবন্দী বসল সবাই।

'কাঞ্চন ফিরে এসেছে সার।' ঘোষণা করল একজন।

'এসেছে?' চোখ তুলে তাকালেন সার ঃ 'তাই তো দেখছি। বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছলে কেন হে? কোথায় কোথায় গেছলে?'

'কলকাতায় সার।' কাঞ্চন উঠে দাঁড়িয়ে জবাব দিল।

'বটে বটে? তা, পালালে কেন বাড়ির থেকে হঠাৎ?'

'কাঞ্চন চুপ করে থাকে। অন্যায় আচরণে বাবার তাড়নার ভয়ে ঘরছাড়া হতে হয়েছিল লজ্জায় সে-কথা সে বলে কি করে?

'জবাব দিচ্ছ না যে?'

'এমনি সার। ইচ্ছে হল চলে গেলাম তাই।'

'ইলিশমাছ খেতে সার।' বলে উঠল একটা ছেলে। 'ভালো মন্দ কত কী খাবার জন্যেই গেছল সেখানে।'

'ইলিশমাছ খেতে কলকাতা।' হেসে উঠলেন, শিক্ষক ঃ 'তবে কথায় বলে বটে, মাছের মধ্যে ইলিশ আর বিছানার মধ্যে বালিশ! বালিশ না হলে যেমন বিছানায় শুয়ে কিছু আরাম নেই, তেমনি ইলিশ মাছ না হলে ভাত খেয়ে কোনও সুখ হয় না।'

'যা বলেছেন সার।' কাঞ্চন তাঁর কথায় সায় দেয়।

'তবে ইলিশ মাছ খেতেই কি কেউ কলকাতায় যায়!' তিনি বলেন—'কলকাতা হচ্ছে দেখবার জায়গা। কত কী শিক্ষণীয় দর্শনীয় রয়েছে সেখানে।'

'সত্যি সার! কত যে দেখলাম কত যে শিখলাম তা আমি বলতে পারিনে।'

'নতুন কী দেখলে বলো দেখি?' তিনি শুধান।

'যা দেখলাম সবই নতুন। হাওড়া স্টেশন, হাওড়ার পুল, রাস্তাঘাট, গড়ের মাঠ, উঁচু উঁচু বাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি-মোটর, মনুমেন্ট, কত! বলে ফুরনো যায়?'

'আর কিছু দেখনি তুমি?'

'দেখেছি বই কি! এত ভিখিরি যে গুণে শেষ করা যায় না। 'আমার মতন, আমার চেয়েও ছোটো ছোটো

ছেলেমেয়েরা বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করছে! ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে খুঁটে খাচ্ছে খাবার। তাদের কারও বাবা মা নেই—আহা!' বলতে গিয়ে কাঞ্চনের চোখে জল এসে যায়।

'আর শিখলে কী নতুন, শুনি একবার?' দুঃখের প্রসঙ্গটা তিনি চাপা দিতে চান।

'নতুন শিখলাম এই যে পৃথিবীতে মাত্র দুটি রেস, হিউম্যানরেস আর হর্সরেস। হর্সরেসের কাজ হচ্ছে হিউম্যানরেসকে খালি ফতুর করা। তার রেস্তটেস্ত সব খতম করে দেওয়া।'

'মোক্ষম শিক্ষা লাভ করে এসেছ দেখছি।' হাসতে থাকেন ক্লাস টিচার, 'তোমার বুঝি দেশবিদেশে ঘুরতে ঘুরে ঘুরে সব দেখতে ইচ্ছে করে খুব—তাই না কাঞ্চন?'

'হ্যাঁ সার! কার না করে বলুন?'

'তা এর জন্যে বাবা মার মনে কষ্ট দিয়ে কাউকে না জানিয়ে বাড়ি থেকে এমন পালিয়ে যাবার কী মানে হয়? তার দরকারটাই বা কী? তুমি তো বয়স্কাউট হয়েই সারা দুনিয়া ঘুরে দেখে আসতে পার—ইচ্ছে করলে বিলকুল বিনে পয়সায়।'

'বয়স্কাউট হয়ে?'

'হ্যাঁ। এই তো এবারই তো আসছে বড়দিনে কলকাতায় বয়স্কাউটদের বিরাট জামবুরি হবে—জামবুরি মানে নানান জায়গার বয়স্কাউট দলের জমায়েত, বিদেশ থেকেও আসবে ছেলেমেয়েরা, বয়স্কাউট আর গার্ল গাইড, বিভিন্ন দেশের যত স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা সব। তারা সবাই এবার মিলবে এসে আমাদের এই কলকাতায়।'

'কি করে বয়স্কাউট হওয়া যায় সার?'

'আমাদের ইস্কুলেরও তো বয়স্কাউট বাহিনী আছে। এখান থেকেও স্কাউট দল সেখানে যাবে। তুমিও আমাদের স্কুলের বয়স্কাউটে ভর্তি হয়ে যেতে পার ইচ্ছে করলে।'

হব সার। আমায় ভর্তি করে নেবেন আপনি?'

'ড্রিল-মাস্টারমশাইকে তুমি ধরো গিয়ে। স্কাউটমাস্টারও তিনিই তো। স্কুলের ড্রিলও করান। ফের স্কাউটদের ড্রিলিং প্যারেডও তিনি করান আবার। তিনি তোমায় স্কাউটের ড্রেস-ট্রেস সব দেবেন। যাক অনেক গল্প হল এবার সবাই তোমাদের হোমটাসক সব নিয়ে এস দেখি...।'

ক্লাস শেষ হয়ে সার চলে যেতেই কাঞ্চন লাফিয়ে উঠল—'আবার যাব আমি কলকাতায়! কী মজা! কী মজা!!'

'এখন থেকেই লাফাচ্ছিস যে।'

'লাফাব না! কী সুন্দর জায়গা রে ভাই! সাত সমুদ্দর তেরো নদীর ধারে...রূপকথার কল্পলোক কলকাতা—'

'তেপান্তরের পারে নিঝুমপুরীতে 'রাজকন্যের বাস।' জিজ্ঞেস করল একজন ঃ 'তা তুই কোনও রাজকন্যের দেখা পেয়েছিলিস সেখানে?'

'রাজকন্যা কোথায়! তবে হ্যাঁ, এক বিয়ে বাড়িতে একবার একটা পেত্নীকন্যার দেখা পেয়েছিলাম বটে।'

'পেত্নীকন্যা?'

'পেত্নীর মতোই প্রায়। খুদে পেত্নী। মেয়েটার নাম মিনি। তবে পেত্নীকন্যা ততটা খারাপ নয়, কিন্তু তার প্যাঁচামুখো দাদাটা যা, ছোটদা না কী, সেই পেত্নীপুত্র আস্ত একটা ভোম্বলদাস।'

'ভোম্বলদাস?'

'কিচ্ছু জানে না একদম। মুখ্যুর ডিম! আমাকে মেনটেন বানান করতে বলেছিল—'

'পেরেছিলিস?'

'পারব না কেন? সোজাই তো বানান। এম-ই-এন টি-ই-এন মেনটেন। তা সে বলে কি, 'তার মানে?'

'বললি মানে?'

'বলে দিলাম। মানে হচ্ছে দশজন মানুষ। ঘুরিয়ে মানুষ দশজনও বলা যায়, একই কথা দাঁড়ায়। কিন্তু সে যে তাও জানে না তা আমি কী করে জানব।'

'তাও জানে না?'

'না, বলে কিনা যে তোমার মুণ্ডু! মেনটেন মানে নাকি প্রতিপালন করা। আর ও-বানানই নয় নাকি। কী কথা! হতমুখ্য কোথাকার।'

'যা বলেছিস! এক নম্বরের মুখ্যু একটা।' কাঞ্চনের সঙ্গে সবাই তারা একমত—'আস্ত একটা ভোম্বলদাসই বটে।'

'ছেলেটা আবার বলে কী জানিস? বলে যে মেনটেন মোটেই এম-ই-এন টি-ই-এন নয়, মেনটেন বানান হচ্ছে এম এ আই এন টি এ আই এন! শোন একবার।'

'কী মুখ্যু রে বাবা! সাত জন্মে এমন মুখ্যু দেখিনি।' উতোর গায় ক্লাসের সবাই। 'মুখ্যু না তো কী! কিচ্ছু জানে না ইংরিজির।'

'মুখ্যু আবার কাকে বলে?' কাঞ্চনের সাফ কথা। 'ইস্কুল পালানো—লেখাপড়া কিছু শেখেনি—বকাটে ছোকরা একটা।'

'ঠিক ঠিক।' সব্বাই তার সঙ্গে একবাক্য।

'আবার আমাকে শুধায় কিনা ছেলেটা—কাঞ্চনের ইংরিজি বলতে পারো তুমি?'

'পারলি বলতে?'

'কেন পারব না? কাঞ্চনের ইংরিজি তো গোল্ড। দিলাম বলে।'

'বাঃ বাঃ! ঠিক বলেছিস মাইরি।' সাধুবাদ দিল সবাই।

'আবার আমায় বলে মেলাতে পারো তোমার নামের সঙ্গে?'

'পারলি তুই?'

'কী করে মেলাব? আমি কি কবি নাকি? কবিরাই কেবল মেলাতে পারে।' কাঞ্চন বলল—'হাতির সঙ্গে নাতি, ঘোড়ার সঙ্গে খোঁড়া তারাই মিলিয়ে দেয়।'

তাদের একজন বলে তবুও—'কেন তোর কাঞ্চনের সঙ্গে দশজন তো বেশ মিলে যায়। তবে তেমন ধারা খাপ খায় না তা ঠিক।'

'খায় না খাপ?' আরেক বন্ধুর জিজ্ঞাসা।

'কোথায় খায়? পাখি সব করে রব এর মতো মিলল নাকি? জল পড়ে পাতা নড়ে-র মতোও নয়। হনুমানের সঙ্গে অনুমান যেমন মেলে তেমনতর হল কী?' কাঞ্চন শুধায়।

'না, তা হল না।' মেনে নেয় তারা।

'তবে হ্যাঁ', একজন বলে, 'কাঞ্চনের সঙ্গে হাঞ্চন মেলে বটে খাসা। কিন্তু হাঞ্চনের মানে আমি ভাই বলতে পারব না। হাঁচি হয় কি না কে জানে!'

'শুনেই ভাই আমার হাঁচি পাচ্ছে।' বলেই ফ্যাচ করে হেঁচে দিল একজন কথার পিঠে।

'এই যে মিলে গেছে সঙ্গে সঙ্গে।' হেসে উঠল সবাই।

'তা তুই কী জবাব দিলি ছেলেটাকে?'

'বললুম মিলটিল আমার মাথায় আসে না বাপু, আমি তোমার কপি নই। তোমার মতন কপিরাই মেলাতে পারে। বলে দিলুম স্পষ্ট।' কাঞ্চন পরিষ্কার করে দেয়, 'ঘুরিয়ে বাঁদর বানিয়ে দিলুম তাকে। সে তখন মিলিয়ে দিল তারপর।'

'মিলিয়ে দিল!' সবাই শুনে অবাক।

'ওই দিল এক রকম—ইংরিজি মিল, যত। বলল যে, কাঞ্চন মানে গোল্ড, বুড় মানুষ মানে ওল্ড, সাহসীর মানে বোল্ড, ধরিয়াছিল মানে হোল্ড, বিক্রয় করিয়াছিল সোল্ড, বলিয়াছিল টোল্ড, চার ফেরতা ফোরফোল্ড, গড়া-পেটা হচ্ছে মোল্ড, গড়াগড়ি দিয়াছিল রোল্ড...এই রকম যত না গোঁজামিল সব।'

'তোকে একেবারে ঘোল্ড করে দিল বল।'

'ঘোল্ড! ঘোল্ড মানে?' জানতে চায় কাঞ্চন।

'মানে, তোকে ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দিল আর কি।' ছেলেটি বলে, 'তা, তুইও ওকে জব্দ করতে পারতিস ওই রকম—বাংলা মানে দিয়ে মিলিয়ে মিলিয়ে।'

'কি রকম করে?'

'কাঞ্চন মানে সোনা, নোনতা মানে নোনা। আতার আবার অপর নাম নোনা, গুণে যাওয়ার মানে গোনা, ঘরের কোণকে বলে কোণা, নাকি সুরে যে কথা কয় তার নাম খোনা, পঞ্চগব্যের একটা হচ্ছে চোনা, ধুনুরির

ভালো করে তাকান হর্ষবর্ধন—'না, তোমার ভেতর জান্তব কিছু তো দেখতে পাচ্ছি নে ভাই!'

'এমনিতর ছেলে স্কুলে স্কুলে দেশে দেশে অনেক আছে—সারা দুনিয়া ছড়িয়ে। সেই সব বয়স্কাউট বাহিনী বছর বছর পৃথিবীর কোনও না কোনও এক জায়গায় গিয়ে জড়ো হয় সবাই। তাদের সেই জমায়েতকেই বলে জামবুরি। এবার সব দল এসে জমেছে আমাদের এই কলকাতায়।'

'তাহলে সে তো এক ইলাহী ব্যাপার হে! হাজার হাজার ছেলে হবে বোধহয়?'

'ঢের ঢের। ছেলে মেয়ে মিলে আরও অনেক—অনেক বেশি—অনেক গুণ।'

'সবারই এই রকম বেশ? এক বয়েস? এই তোমার মতই?' হর্ষবর্ধন অবাক হন ঃ 'তাহলে শুধু অনেক গুণ কেন, অনেক রূপও দেখা যাবে নিশ্চয়?'

'নিশ্চয়।'

' কোথায় হচ্ছে সে জামবুরিটা?'

'গড়ের মাঠে!'

'গড়ের মাঠে! তাহলে তোমায় এই কালীঘাটে দেখছি কেন এখন?'

'আমাদের ছাউনি পড়েছে গড়ের মাঠে। কেল্লার কাছটায়। কালীঘাটে বেড়াতে এসেছিলাম সকালে। মাকে দেখতেই। আমি একলাই এসেছি কেবল।'

'তোমার তো ভারী মাতৃভক্তি দেখছি...তোমার মা থাকেন বুঝি এখানে?'

'না। আমার মা থাকেন অ—নে—ক দূরে। এখান থেকে অনেক অনেক মাইল দূরে। সাতসমুদ্দুর তেরোনদী পেরিয়ে তেপান্তরের পারে অচিনপুরীর ধারে।...রূপকথার দেশে থাকেন আমার মা! আহা, কবে যে আমার মাকে দেখতে পাব আবার!' তার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে।

'মার জন্যে তোমার মন কেমন করছে বুঝি?...'

'না না, মন কেমন করবে কেন? আমি কি কচি খোকা নাকি? তা নয়, তবে কিনা...কি রকম যেন এক রকম...।' এর বেশি সে প্রাঞ্জল হতে পারে না।

'এখানে তোমার মাসিমার বাড়ি বেড়াতে এসেছিলে বুঝি?'

'না, না মাসিমা নয়। বললাম না যে, মা? আমার মারও মা।'

'বুঝেছি, তোমার দিদিমা।'

'দিদিমা নয়। দিদিমারও মা তার মারও মা...আবার আবার তার তার মার মার মার মা...'

'বাবা! এ যে এক মার মার কাট কাট ব্যাপার!'

'আপনারও মা আমারও মা...আপনার আমার বিশ্বসুদ্ধু সবার মা। তিনি যে কালীঘাটে থাকেন তা আপনি জানেন না বুঝি?'

'ও বাবা! তুমি দেখছি হেঁয়ালিতেও কথা কইতে পার! একটু স্পষ্ট করে বল বাপু!' তিনি বলেন ঃ 'হেঁয়ালি ধাঁধা এসবের তত্ত্ব আমার মগজে আসে না।'

ছেলেটা এবার একটু বিরক্ত হয়—'এর মধ্যে হেঁয়ালিটা আপনি পাচ্ছেন কোথায়? মা-কালীকে জানেন না এমন মাকাল কেউ আছে নাকি দুনিয়ায়? আমি তো তা জানতুম না।'

'ও মা! তুমি মা-কালীর কথা বলছ! হর্ষবর্ধন মা-কালীর মতোই নিজের জিভ কাটেন...'সে কথা বলতে হয়। আরে, আমিও যে সকালে উঠেই মাকে দর্শন করতে গেছলাম। তারপর একটা কাজ সেরে বাড়ি ফিরছি এখন।'

'আপনার বাড়ি কোথায়?'

'চেতলায়। সেইখানেই আমার কারবার সেইখানেই আমার কারখানা—আমার থাকবারটাকবার জায়গা সব কিছু।' বলে তিনি নিজের ঠিক-ঠিকানা বাতলে দেন—'একদিন এস না বেড়াতে এর মধ্যে। আমাদের কাঠের কারখানা দেখবে'খন।'

'কী আছে কাঠের কারখানায়? দেখবারটা কী আছে তার?' ছেলেটি জানতে চায়। একটু যেন কঠোর ভাষায়।

'কাঠের কাণ্ড কারখানা।' হর্ষবর্ধন জানান ঃ 'কাঠের কাণ্ড আর কাঠের কারখানা একসঙ্গে দেখতে পাবে—এক জায়গায়।'

'কাঠের কাণ্ডকারখানা? কাঠের আবার কাণ্ডকারখানা কী?'

'বড় বড় কাঠের কাণ্ড। কাঠের কাণ্ড কাকে বলে জান না।'

'কাঠ আবার কী কাণ্ড করবে মশাই? কাঠ তো নির্জীব বস্তু কোনও জন্তু-জানোয়ার তো নয়।'

'কাঠের কাণ্ড হয় না? এলে দেখাব। বড় বড় অরণ্যকে আমরা পেড়ে ফেলি। জঙ্গল কেটে সাফ করি সব। জঙ্গলের বড় বড় গাছটাছ কেটে তক্তা করি। আবার সেই তক্তার থেকে রকম রকম জিনিস তৈরি হয়। খাট পালঙ্ক আলনা আলমারি চেয়ার টেবিল—নানান চেহারার কত কী বানাই! সব আমাদের সেই কারখানায়?'

'তা তো বুঝলুম। সে তো আপনাদের কাণ্ড...আপনাদের কারখানা। কাঠ কি তার ভেতর তার নাক কান গলাতে আসছে নাকি, যে তার কোনও কাণ্ড হতে যাবে?'

'হবে না? প্রকাণ্ড সব গাছের কী থাকে? শাখা-প্রশাখা ডালপালা থাকে না? তাদের মোটা মোটা ডালকে কী বলে? বলে বৃক্ষকাণ্ড। বৃক্ষ তাদের নিজের দেহ থেকে বার করে বলেই বলে কি না কে জানে! বৃক্ষের সেই অপকর্মকেই বলে কাণ্ড। গাছের সেই সব কাণ্ড কেটে কলকাতায় নিয়ে আসি আমরা। তারপর করাতের চোটে চিরে তক্তা বানাই ইয়া ইয়া।'

'করাতের কারখানা আপনাদের। বুঝেছি।'

'আসবে দেখতে?'

'যাব না হয় একদিন। ঠিকানা তো জানলাম। যেতে আর কি? গেলেই হল।'

'এস। আমাদের কাজ কারবার তো জানলে, এখন তোমরা স্কাউটরা কী করো বললে না তো?'

'কত কী কাজ আমাদের—তার কি কোনও ফিরিস্তি দেওয়া যায়। তবে একটা কাজ আমাদের রোজ করতে হয়—রোজই করবার। সবার করবার। সবাইকেই করতে হয়।'

'রোজগারের কাজ? হ্যাঁ, সবাইকেই তা করতে হয় বটে। তা, তোমাদের এই ছোটো ছোটো ছেলেদেরও এই বয়স থেকে রোজগার করতে হচ্ছে? বল কী?'

রোজগার নয়, রোজকার কাজ। রোজ করবার একটা কাজ রোজ রোজ করবার।' সে বিশদ হবার চেষ্টা করে।

'কী কাজটা শুনি?'

'মানুষের উপকার। কারও না কারও কোনও না কোনও উপায়ে একটা না একটা উপকার করতেই হবে আমাদের। রোজ।'

'একটানা উপকার?' অবাক হন হর্ষবর্ধন ঃ 'কিন্তু কারও উপকার করার জন্যে এত টানাটানির কী দরকার?'

'না, একটানা নয়, একটাই মাত্র।'

'বা। সে তো খুব ভালো কথা হে। বা বেশ বেশ। তা, এস একদিন তা হলে। আমি নামব এখানে। ...আলিপুরের জজকোর্ট ছাড়িয়ে গিয়ে বাঁ দিকে যে রাস্তা গেছে তার মোড়টায় নামব আমি....এখানটার সবটাকেই চেতলা বলে...তবে সেই রাস্তা ধরে খানিকটা এগুলেই আমাদের কারখানা। আর তারই লাগাও বাড়িটা। খুব খাওয়াব তোমায়, এস একদিন, কেমন?' তারপরে তাঁর পুনরপি অনুযোগ ঃ 'এস, কেমন? তোমাকে আমি উপকার করতেও দিতে পারি।'

হর্ষবর্ধন নামবার জন্য দাঁড়ান। ছেলেটাও তার পাশে এসে খাড়া হয়।

'তুমিও এখানে নামবে নাকি?' তিনি জানতে চান।

'না না। আমি এই ভায়া আলিপুর এসপ্লানেডের গাড়ি ধরেই চলে যাব সোজা, নামব গিয়ে সেই কেল্লার কাছটায়, যেখানে আমাদের সব ছাউনি পড়েছে।...'

'তবে এখন পাদানিতে এসে দাঁড়ালে যে।'

'দেখি যদি আপনার কোনও উপকারটুপকার করা যায়। এখুনি করতে পারি যদি।' ছেলেটি বলে ঃ 'করতে পারা যাবে বলে মনে হচ্ছে যেন।'

হাসলেন হর্ষবর্ধন।—'তুমি আমার কি উপকার করবে হে, এইটুকুন ছেলে হয়ে। বরং তোমার যদি কখনও কোনও দরকার পড়ে বোলো আমায়, আমি হয়তো তোমার কোনও উপকারে লেগে যেতে পারি এক সময়। বিস্তর টাকা আমার। তা জান?'

'টাকা দিয়ে কি কারও কোনও উপকার করা যায় কখনও?'

'তাহলে কি দিয়ে করা যায়?'

'উপকার করে উপকার করতে হয়?'

'তাই না হয় করব আমি কষ্টেসৃষ্টে করব না হয়।'

'পরের করুন, আমার নয়। আমি কি কারও পর? আমি বয়স্কাউট। সবার আপনার। সবাই আমার আপনার। আপনি পরের উপকার করবেন—কারণ, পরোপকার করাটাই নিয়ম। আমাদের বয়স্কাউটদের কি কেউ উপকার করতে পারে? উল্টে আমরাই তার উপকার করে দিই।'

'বেশ তো, বেশ তো মন্দ কি! আমি তাহলে নামি এখন এখানে। তুমি এস একদিন... কেমন?...ধপাস।'

ধপাস কথাটা তিনি আওড়ান না, তাঁর আগাপাশতলা উচ্চারিত হয়।

আপাদমস্তক বলতে হয় কথাটা।...নামতে না নামতে হর্ষবর্ধন চিৎপাত হয়ে পড়েছেন মাঝ রাস্তায়।

ছেলেটাও তড়িদ্বেগে ট্রাম থেকে নেমে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

'তখুনি জানতাম আপনি আছাড় খাবেন। উল্টো দিকে মুখ করে নামছিলেন তো।' তাঁকে ধরে উঠে দাঁড়তে সে সাহায্য করে—'উটমুখোর মতন উল্টোমুখো হয়ে দাঁড়াতে দেখেই আমার সেই ধারণা হয়েছিল। আপনার পাশে এসে খাড়া হয়েছি তখনই। কখন আপনি পড়ে যান, আর কখন আপনাকে একটুখানি তুলে ধরতে হয়, আপনাকে সাহায্য করতে পারি আমি।'

'বেশ ছেলে তো তুমি!' হতবাক হন হর্ষবর্ধন!

'প্রশংসা করে লজ্জা দেবেন না। এই আমাদের কাজ মশাই!' ছেলেটি সবিনয়ে জানায়।—'উপকার করার সুযোগ পেলে আমরা কখনও তা হাতছাড়া করতে পারি নে।'

'উত্তম কাজ।' হর্ষবর্ধন তবুও কেন খুশি হন না যেন—'তুমি যদি জানতে যে অমন করে ট্রাম থেকে নামলে আমি পড়ে যাব, আছাড় খাব, তাহলে তার আগেই কেন আমায় সাবধান করলে না? পাশেই দাঁড়িয়েছিলে যখন?'

'বারে! তাহলে আপনাকে সাহায্য করবার এই সুযোগ আমি পেতাম নাকি?' ছেলেটিও তাঁর কথায় কম অবাক হয় না।

'বারে! তোমাকে উপকার করার সুযোগ দেবার জন্যে চাকার তলায় পড়ে আমি যদি কাটা পড়তাম এখন?'

'তার জন্যেও তৈরি ছিলাম বইকি! তার অপেক্ষাতেও ছিলাম তো। হাত পা কাটা পড়লে তক্ষুনি অ্যামবুলেন্স ডেকে আপনাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার দেরি হত নাকি আমার? দুঃখের বিষয় ব্যাপারটা অদ্দূর গড়াল না। কেবল কয়েক ফিটই আপনি গড়ালেন। তার বেশি নয়। যাকগে, যথালাভ! এটাও কিছু কম ফিট নয়। যেদিন যা কপালে থাকে। যা জোটে আমাদের বরাতে। যতটুকু করা যায়।'

'তুমি ভারী হতাশ হয়েছ বোধ হচ্ছে।'

'তা একটু হয়েছি হয়তো। সে জন্য দুঃখ করিনে, কোনওদিন আবার পুষিয়ে যাবে ফের আমার। আবার একটা মোক্ষম সুযোগ পেয়ে যাব কোনও এক সময়—আরেক মোকায়। অন্য মোকামে।'

'আমার থেকে পাচ্ছ না বাপু আর। আমি এবার থেকে সাবধান হয়ে গেছি।' গায়ের ধুলো ঝেড়ে বললেন হর্ষবর্ধন ঃ 'ভালো কেউটের পাল্লায় পড়েছিলাম বাবা!'

'কেউটে কী বলছেন? কেউটে কী? স্কাউট তো।' ছেলেটা ভুল শোধরাতে যায়।

'ওই হল, কেউটের পাল্লায় না পড়ে কাউটের পাল্লায় পড়েছি—একই কথা। আর কোনওদিন ট্রামে তোমার পাশে আমি খাড়া হচ্ছিনে বাবা! তোমাকেও পাশে দাঁড়াতে দিচ্ছিনে আমার।' সাফ কথা তাঁর।

'কেন, কী হল?'

'কী হল—বলছ তুমি আবার! যা হবার তা হল। ফের যদি আরও আমি তোমার পাশে দাঁড়াই আর সোজাসুজিও নামতে যাই যদি, আমার নামার সময় তুমি আমায় উল্টে দেবে নির্ঘাত...!' তিনি কন ঃ 'চাইকি, ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েও আমার উপকার তুমি করতে পারো।'

'ছি ছি! একি বলছেন আপনি!'

'ঠিকই বলছি। ওলটপালট করে দেবে তুমি আমার—গড়বড় করে দেবে সব। তারপর কোমর বেঁধে তুমি আমার উপকার করতে লাগবে, কী সর্বনেশে ছেলে বাপু তুমি!'

'আমাদের স্কাউটের ধর্ম তা নয় মশাই! উপকার করাই আমাদের কাজ, অপকার করা নয়। অপকার করে কি কারও উপকার করা যায় কখনও?'

'তাহলে তুমি নামবার আগে আমায় সাবধান করলে না কেন?'

'আপনার উপকার করার জন্যই। সেই সুযোগের অপেক্ষায় কেবল। উপকার করার আমার সুযোগ হল না সে আমার কপাল, আপনি কী করবেন! আমিই বা কী করব তার!' সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল—'তার জন্যে দুঃখ করে কী লাভ!'

'আমারও সেটা কপাল বলতে হবে। খুব কপালজোর যে তোমার কবলে পড়ে আমায় আরও উপকৃত হতে হল না...অ্যামবুলেন্স চেপে হাসপাতালে গিয়ে তারপরে হাত পা ছেঁটে বেরিয়ে এসে—তারপর ওই ডাক্তারি লগিগুলোর—কী নাম কে জানে—!

'ক্রাচ।'

'তারপর ক্রাচ ধরে সারা জীবন ঘুরে বেড়াতে হল না। জীবনভোর তোমার উপকারের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতে হল না আমায়, আমার সৌভাগ্য।'

'আপনি বিচ্ছিরি রকম উল্টোপাল্টা বোঝেন যত। আর কথাও বলেন ঠিক তেমনি ধারা। চলুন আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'না বাবা, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আর এক পাও আমি এগুচ্ছিনে। ভয়ঙ্কর ছেলে তুমি, হয়তো কোনও ছুতোয় এই পথের উপরই আমার উপকার করে বসবে। সর্বজন সমক্ষে করে ফেলবে কাণ্ডটা। তোমার সেই উপরি উপায়ের আগের থেকেই সাবধান হওয়া ভালো। সাবধানের বিনাশ নেই।

'পথ চলতি কী আবার উপকার করব আপনার?'

'ধাক্কা মেরে একটা ট্যাকসি কি বাসের তলায় ফেলে দিতে পারো, তারপর আমায় বেহুঁশ অবস্থায়, উপকার কেন, আমার যা কিছু করা খুশিমতো করবার কিছুই তোমার অসাধ্য হবে না তখন...।'

'ইস, আপনি বেজায় রেগে গেছেন দেখছি! সত্যি, এমনই হয় বটে। স্কাউটমাস্টারও আমায় বলেছিলেন তাই, উপকার করলে লোকে উল্টো বোঝে বেজায়—হিতে বিপরীত হয়ে যায়। তা বলে আমাদের ঘাবড়ে গেলে হবে না। পেছপা হওয়া চলবে না', বলল ছেলেটি ঃ 'আপনি আমায় যেতে বলেছিলেন না, তাই আপনার বাড়িটা দেখে যেতে চেয়েছিলাম। তা আপনি যখন আমায় নেমন্তন্ন করছেন না তখন আর তার দরকার নেইকো।'

'কে বললে করছি না? আলবত করছি। নেমন্তন্ন করে ফের ফিরিয়ে নিতে যাব কেন? হর্ষবর্ধনরা দিয়ে কিছু ফেরত নেয় না কখনও। তুমি এস একদিন, তবে আজ নয়। আজ এলে তোমায় কাঁচকলা খাওয়াব। ক দিন বাদ এস। রাগটা পড়তে দাও।'

'কদিন বাদ এসে আপনার বাড়ি পাত্তা পাব কি না কে জানে! চেনা বাড়িই খুঁজে পাওয়া যায় না এই কলকাতায়। এখানকার মানুষ আর বাড়ি চেনা দায়, সব এখানে একাকার। এর আগেরবার বাড়ি থেকে পালিয়ে যখন এসেছিলাম, তখন একটা বাড়িতে প্রায় রোজই বিয়ের ভোজ খেতাম, খেতে যেতাম, কিন্তু এবার এসে হাজার চেষ্টা করেও, সে বাড়িটা যে কোথায় ছিল তার কোনও খোঁজ পাচ্ছি না।'

'রোজ বিয়ের ভোজ খেতে, এমন কী বাড়ি গো! বিয়ে হত সেখানে রোজ রোজ?' হর্ষবর্ধন তাজ্জব হয়ে যান।—'এত এত বিয়ে হত কার আবার! বিয়ে তো একবারই হয় জানি।'

'সেটা ছিল একটা বিয়ের ইস্কুল। ইস্কুল বলে সাইনবোর্ড লাগানো ছিল বাড়িটার মাথায়—আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

'ওহো! বুঝেছি। বিয়ের ইস্কুল নয়। সেটা একটা ইস্কুল বাড়ি। ছুটির সময় বিয়ের জন্যে ভাড়া খাটাত, এমন অনেক ইস্কুল আছে এই কলকাতায়। আবার ইস্কুলের সময়ও, সন্ধেবেলায় চেয়ার টেবিল সব একটা ঘরে সরিয়ে রেখে পাত্রপাত্রীকে বাকি ঘরগুলো ভাড়া দিয়ে দেয়—উপরি উপায় হয় তাদের।'

'তা সে যাই হোক, দেখতেই পাচ্ছি না বাড়িটা, হারিয়ে গেছে এক্কেবারে। কোথায় যে পালিয়ে গেল বাড়িটা কে জানে!'

'সেবারে তুমি বাড়ির থেকে পালিয়েছিলে এবার বাড়িই তোমার থেকে পালাল।' হাসতে থাকেন হর্ষবর্ধন।

'তা সে বাড়িটাকে এমন করে খুঁজছ কেন হে? বিয়ে কি আর কোনও বাড়িতে হচ্ছেনা?'

'সেই বাড়িতে একটা মেয়েকে দেখেছিলাম। সূর্পনখা তার নাম। যদি আবার তার দেখা পাই।'

'ও! তাই? ভালো কথা তোমার নামটা কী, বললে না তো? এখনও জানি নে আমি।'

'কাঞ্চন।'

'কাঞ্চন—কী?'

'কী মানে?' সে শুধায় : 'তাই জানতে চাইছেন?'

'মানে, উপাধি?'

'উপাধি, মানে কাঞ্চনের মানে জানতে চাইছেন তো? কাঞ্চন মানে সোনা, নাকি সুরে যে কথা কয় তাকে বলে খোনা, আঙুলে যা করা হয় তার নাম গোনা, যার থেকে লেপ বালিশ সব তৈরি—তা হল তুলো ধোনা, নোনতা জিনিসের নাম নোনা, আবার আতারও অপর নাম হচ্ছে তাই—'

'কী যা নয় তাই বকছ! বাতের ডাক্তার না মাস্টার কী যেন বলেছিলে, সে তোমার সম্বন্ধে ভুল বলেছে।—'

'বাতের ডাক্তার আপনি পেলেন কোথায় আবার?'

'আহা, ওই যে কাউটমাস্টার না কী যেন বললে না? ওটা হবে গিয়ে গাউটমাস্টার। তা—তোমরা কি ডাক্তারকে মাস্টার বলে ডাকো নাকি?'

'তা কেন বলব! স্কাউটমাস্টার হচ্ছেন স্কাউটমাস্টার।'

'তা তিনি যাই হোনগে, আমার দেখার দরকার করে না। কিন্তু তোমায় যে তিনি ভুল শিখিয়েছেন সেকথা আমি বলতে বাধ্য। তুমি হচ্ছ একটা—কী বলব?—আসলে একটা বয়েজগাউট? বুঝেছ। বয়স্কাউট কখনওই নয়।'

'বয়েজগাউট? তার মানে?'

'মানে পরিষ্কার। বয়েজ মানে ছেলের, আর গাউট হচ্ছে বাত। বয়েজগাউট মানে ছেলের বাত।'

'বাত আপনি কোথায় দেখলেন আমার।'

'কেন, তোমার মুখে।'

'মুখে বাত? আমার?' ছেলেটি বিস্ময়ে বাতাহত কদলী কাণ্ডের মতোই প্রায় ভূপতিত।

'মুখেই তো দেখছি আপাতত।' তিনি বাতলান ঃ 'তবে শুনছিও বলা যায়। বাত মুখেও হতে পারে বইকি। সর্বাঙ্গেই হয়। তবে মুখেরও ওটা একটা ব্যারাম। তোমার বেজায় বাত। বাতচিত দারুণ। বোলচাল খুব।'

'ও, সেই বাত! হিন্দি বাত! তাই বলুন।' কাঞ্চন হাসে।

'ওইটে আমাদের বাড়ি। ভালো করে চিনে নাও।'

'দেখলাম।' কাঞ্চন বিদায় নেয়। আচ্ছা তাহলে আসি এবার।'

'এসো। নিশ্চয়। খুব শিগগিরই একদিন এসো আবার?' তাঁর পুনরামন্ত্রণ—'আজ তো আমাদের বাতচিত হল কেবল, সেদিন বেশ ভালো করে আলাপ করা যাবে। কেমন?'

'হ্যাঁ। আজ বাতচিত মন্দ হল না। তা বটে।' কাঞ্চন সায় দেয় তাঁর কথায় ঃ 'আমার বাত আর আপনার চিত! আমাদের দুজনের বাতচিত। দুটোই হল বেশ।' সে হাসতে হাসতে বলে।

'ধন্যি ছেলে তুমি!' হর্ষবর্ধন নিজের মনেই বলেন। বলে নিজের বাড়ির মধ্যে পাড়ি দেন।

।। তিন ।।

বাড়িতে পা বাড়িয়েই হর্ষবর্ধন ভাইয়ের দর্শন পেলেন।—'আজ যা একটা কাণ্ড হল, কী বলব! শোন দাঁড়া।'

গোবর্ধন দাঁড়ানোই ছিল, কান খাড়া করল দাদার কথায়—'কীক্‌কাণ্ড?'

'যা একখানা বয়স গৌটের পাল্লায় পড়েছিলুম আজ! আরেকটু হলেই হয়ে গেছল আমার। প্রাণে প্রাণে বেঁচে গেছি ভাই রে!'

'বয়স গৌট? সে আবার কি গো দাদা?'

'বয়স গৌট কাকে বলে জানিসনে বুঝি?'

'জানব না কেন? সমসকৃত আমার ভালোই জানা আছে। বয়স মানে বয়েস, তবে যদি বায়স হয় তাহলে ওর মানে হবে গিয়ে কাক। দাঁড়কাকও হতে পারে। আর গৌট হচ্ছে...গৌ গাবৌ গাব ঃ—অর্থাৎ কিনা, একটা গোরু। গোরুর পিঠে একটা বায়স, মানে কিনা, একটা কাক গোরুর পীঠস্থানে বসেছিল বুঝি? তা সে আর অবাক কাণ্ড কিসের! আকচারই বসে।'

'কাক কেন হতে যাবে রে? ছেলেই তো একটা? পুঁচকে একটা ছেলে! বয় মানে জানিসনে মুখ্যু?'

'ও! সেই ছেলেটাই বুঝি আস্ত একটা গোরু? তা হয়, অমন হয়ে থাকে। বেশির ভাগ ছেলেই তো আসলে গোরু। তবে ছেলেবেলায় সেটা টের পাওয়া যায় না, বড় হলেই ধরা পড়ে। যতই বয়স বাড়ে ততই তার গোরুত্ব প্রকাশ পায়। শিং বেরয় কিনা! তা তোমায় কি গুঁতিয়ে দিয়েছিল ছেলেটা?'

'তোর মুণ্ডু! মোটেই কোন গুঁতোগুঁতি ব্যাপার না। গৌট মানে হচ্ছে বাত। আর বয় মানে ছেলে।' ছেলেটার কথা মনে পড়তেই তাঁর চমক লাগে এখনও—'ইস! কী বাত রে বাবা ছেলেটার! সে কথা বলবার নয়।'

'একটা বেতো ছেলের পাল্লায় পড়েছিলে বুঝি?'

'বলতে পারিস। কিন্তু এ বাত সে বাত নয়। মুখের বাত। হিন্দি বাত—কিন্তু বাংলায় বলছে, এই যা।'

'বাংলায় বলছে হিন্দি বাত! তাজ্জব!' সোনার পাথর বাটির মতোই কথাটা শোনায় যেন তার কানে—'তার মানে?'

'তার মানে বয়স্কাউট। মানে, ছেলেটা যা বললে। হয়তো স্কাউবয়েটও হতে পারে। তার মানে যারা পরের উপকার করে বেড়ায়।'

'তাহলে হয়েছে। গোরুই তো হবে। গোরুরাই তো বিশ্বসুদ্ধ লোকের উপকার করে। যারা পরের উপকার করে তারা গোরু ছাড়া আর কী? তবে ওটা যদি তোমার বয়স্কাউট না হয়ে কাউবয়েট হয়...'

'তবে?'

'তবে ওর মানে হবে বয়াটে গোরু। যে গোরু কিনা বয়ে গেছে। উচ্ছন্নে গেছে—অর্থাৎ কিনা বারোটা বেজে গেছে যার।'

'বয়াটে গোরু? বলছিস তুই?'

'ছেলেরা বয়ে গেলেই গোরু হয়। কিংবা, গোরু হলেই বয়ে যায়। মানে যেদিক দিয়ে ধরো একই কথা। মানে ওই গোরুই অর্থাৎ।'

'তা তো বুঝলুম।' কিন্তু হর্ষবর্ধনের বোঝাটা মোটেই হালকা হয় না, কোথায় যেন খটকা থেকে যায় ঃ 'কিন্তু গোরু কেন হতে যাবে রে, গোরু তো নয়।'

'বা, গোরুই তো হবে দাদা! গোরুর মতন উপকারী জীব—জীবই বলো আর জন্তুই বলো—আছে নাকি এই দুনিয়ায়? কেন, ছেলেবেলায় বাংলা রচনার বই-এ পড়নি তুমি?'

'পড়েছি তো, পড়ব না কেন? কিন্তু গোরু তো নয়...'

'আলবাত গোরু।'

'আহা, গোরু কেন হবে রে! ছেলে যে। ছোট্ট একটা ছেলে। একসঙ্গে এক ট্রামে এলাম এতক্ষণ।'

'একটা ছেলে! বলো কি দাদা?' গোবর্ধন বিস্ময়ের ভারে বিমূঢ় ঃ 'ছেলেরা গোরু সেজে বিশ্বসুদ্ধ লোকের উপকার করে বেড়াচ্ছে? আমার বিশ্বাস হয় না।'

'আহা গোরু সাজবে কেন? গোরু সাজতে যাবে কেন? শিং নেই লেজ নেই—হাম্বা হাম্বা আওয়াজ না, তবু তাকে বলব গোরু? কেন? কেন, গোরু না সাজলে, হাম্বাগ না হলে কি কারও উপকার করা যায় না? পৃথিবীতে গোরুই একমাত্র উপকারী জন্তু, আর আমরা মানুষরা কেউ কিছু নয়? দামোদরের বানে ভেসে এসেছে নাকি যত স্কাউবয়েট—তুই যে কী বলিস।'

'বা, আমি কখন বললাম, তুমিই তো বলছ।'

'গোরু সেজেছে বলেছি আমি? দিব্যি খাকি রঙের হাফপ্যান্ট, শার্ট, খাসা পোশাক পরে গলায় রুমাল জড়িয়ে পরের উপকার করতে বেরিয়েছে কোমর বেঁধে। আর, তুই কিনা—আচ্ছা গোরু যা হোক!'

'গোরু যদি নয় তো কাউবয়েট মানে কি শুনি?' গোবরা এবার গোঁ ধরে—'কাউ মানে কী তাহলে?' জেরায় ফেলে উল্টে দাদাকেই সে গুঁতোতে যায়—জেরবার করতে চায় এবার।

'কাউবয়েটই নয়। অন্য একটা কথা। বাউস্কয়েটও হতে পারে। কয়বয়েট হওয়াও সম্ভব। আর যদি বয়কয়েটই হয় তাহলেই বা কী কর'ছি! কী যে কথাটা, মনে আসছে জিভের ডগায় আসছে না। তবে বেশ মনে পড়ছে একেবারে অন্য কথা। আবার একেবারে অন্য কথাও নয়। কথাটা ওর মধ্যেই কোথায় রয়েছে, তবে বিচ্ছিরি ভাবে গুলিয়ে গেছে কি রকম! আলাদা করে বার করা যাচ্ছে না। আচ্ছা দাঁড়া, ছেলের ইংরিজি কী, বল দেখি?'

'ছেলে? ছেলের ইংরিজি হোলগে ল্যাড।'

'উঁহু। ল্যাড নয়। অন্য ইংরিজি।'

'সান।'

'সান? সান?' হর্ষবর্ধন এবার বেশ বিগড়ে যান—'তুইকি আমাকে নেহাত উজবুক ঠাউরেছিস নাকি? যা নয় তাই বোঝাচ্ছিস। সান কাকে বলে আমি জানিনে বুঝি? সান মানে সূর্য, সবাই জানে।'

'তা হবে তা হবে'। গোবরা দাদার কথাটা মেনে নেয় ঃ 'সূর্যই হবে বটে। সানশাইন বলে একটা কথা আছে মনে পড়ছে আমার।'

'তবেই বোঝ। সূর্য ছাড়া আর কী হতে পারে? ছেলে হওয়া কি সম্ভব? ছেলে আবার কি শাইন করবে? ছেলেরা কি গার্জেন যে সই করতে যাবে? ছেলের কম্মই নয় শাইন করা। শাইনিং ছেলে কটা পাওয়া যায়!'

'তা বটে।' গোবর্ধন নিজেই সই হয়ে যায়।

'ও সব ল্যাড ফ্যাড বাদ দে। তাছাড়া তোর আর কী বিলিতি ছেলে আছে বার কর।'

'বয়? বয় নয়তো দাদা?' গোবরা সন্দিহান হয়।

'দাঁড়া দাঁড়া'—দাদা শশব্যস্ত হয়ে পড়েন—'বয়ই হবে বোধহয়। দাঁড়া মিলিয়ে দেখি। কথাটা কী বললাম। স্কাউ বয়েট? স্কাউ বয়েট? স্কাউ—উঁহুহু, স্কাউ তো নয়। স্কয়বাউট? স্কয়বাউট? এইবার বসে গেছে। এসে পড়েছে প্রায়। আরেকটু এলেই এসে যায়। বেশ মালুম হচ্ছে যে এসে গেছে। আহ! স্কয়বাউ—! এই যে, আরেকটু হলেই হয়ে যায়।...হয়েছে হয়েছে! হয়ে গেছে!'...

হর্ষবর্ধনের কেকা-ধ্বনি আর্কিমিডিসের ইউরেকা-ধ্বনিকে ছাপিয়ে যায়।

'বয়স্কাউট!' বয়স্কাউট! কথাটা হচ্ছে বয়স্কাউট!'

'ও একই কথা!' গোবরা ঠোঁট ওলটায় ঃ 'ঘুরিয়ে নাক দেখাও কি সোজাসুজি তাকাও—দাঁড়াল একই। স্কাউবয়েটও যা, বয়স্কাউটও তাই। আগে গোরু ছিল বয়াটে, এখন বয় হল গোরুটে। কথা দাঁড়াল সেই একই!'

'তোর মুণ্ডু! দুটো এক হয়ে গেল? গোরুর চারটে করে পা, আর এদের দুটো করে যে—এই বয়স্কাউটদের? তবু ওরা গোরু হয়ে যাবে তোর কথাটাতেই? বাড়তি পা-টা না থাকলেও?'

'তার আমি কী জানি! আমি তো আর স্কাউবয়েট দেখতে যাইনি, তুমিই দেখেছ। তার পা আছে কি না, লেজ আছে কি না, শিং আছে কি না—তুমিই জান!'

'আবার বলে স্কাউবয়েট? কোথাকার স্কাউরে।' দাদা ভাইকে তাড়া লাগান—'বলছি না বয়স্কাউট! মুখস্থ করে ফেল শিগগির।'

'আমার দায় পড়েছে! করতে হয় তুমি করোগে।' গোবরা গরম হয়ে ওঠে।

হর্ষবর্ধন তখন নরম হন ঃ 'না করলি, না করতে পারিস, নাই করলি! ইংরিজি কথাগুলো একটু কটমট—মুখস্থ করা একটু শক্তই বইকি! মানে রাখা তো আরও কষ্টকর! সবাই কি আমার মতো পারে ভাই? যাক গে, এখন গল্পটা শোন...ভারী মজার কাণ্ড! ট্রামে চেপে আসছি আর সেই স্কাউবয়েটটা আমার পাশে এসে বসেছে। ওটা যে একটা বাউস্কয়েট তা আমি টেরই পাইনি। কি করে পাব? একটা ছেলে পাশে বসে চলেছে এই জানি, ও যে আস্ত একটা স্কয়বাউট, জানব কি করে? সে-কথা তো ওর গায়ে লেখা নেইকো। জানলাম ঢের পরে, যখন মরতে মরতে বেঁচে গেছি, যখন আরেকটু হলেই ট্রামে কাটা পড়েছিলুম আর কি। সেই বয়স্কাউটটাই বাঁচিয়ে দিলে!...মানুষের উপকার করা ওদের ধর্ম কিনা!' হাঁফ ছাড়বার জন্য থামতে হয় হর্ষবর্ধনকে।

ট্রামের মারপ্যাঁচে দাদার বাজে খরচা হয়ে যাচ্ছিল ভাবতেই গোবরা শিউরে ওঠে—'ভারী ভালো তো সেই স্কয়বয়েট!' অপরিচিত উপকারীর উদ্দেশ্যে অযাচিত প্রশংসাপত্র দিতে সে কার্পণ্য করে না।

'না। স্কয়বয়েট না—' হর্ষবর্ধন শুধরে দেন ঃ 'বয়স্কয়েট। তা, সেই বয়স্কয়েটটা করল কি...আমি ট্রাম থেকে নেমেছি, সেও নেমেছে, এক জায়গাতেই নামলাম আমরা। সে আমার কাছে এসে বলল, দেখুন মশাই, কিছু মনে করবেন না, আমরা হচ্ছি বাউস্কাউট। আমাদের কাজই হচ্ছে প্রত্যেক দিন কারু না কারু কিছু না কিছু উপকার করা। এখানে আমার নামবার কথা নয়। কিন্তু আপনার উপকার করবার জন্যই নামতে হল আমায়।'

'বল কি? এই কথা বলল সে?' গোবরার চোখ প্রায় হাঁ হয়ে যায়।

'বললই তো। শুনে তো আমি ভারী ঘাবড়ে গেছি—বলতে কি! কী উপকার করবে আবার আমার? ধরে মার লাগাবে না তো? গায়ে পড়ে কেউ উপকার করতে এলে আমার ভীষণ ভয় করে ভাই।... আমি বেশ থতমত খেয়েছি...'

'তা—ছেলেটা কি ধরে তোমায় মার লাগাল?' গোবরা জামার আস্তিন গুটোয়।

'উঁহু, মোটেই তা নয়...' ভাইয়ের রাগের ঘনঘটায় দাদার হাসি পায়—'মারল তো নাই-ই, মারা পড়ছিলাম! উল্টে বাঁচিয়ে দিল বরং। ট্রাম থেকে নামতে কেন যে আমার হ্যাঁচকা টান লাগত অ্যাদ্দিন বুঝিনি। আমার দিব্যচক্ষু খুলে দিয়েছে সে। স্কয়বাউটটা বলল আমায়, দেখুন যা নেমেছেন নেমেছেন, আর কখনও অমন নামবেন না। ট্রাম যে-মুখো যাচ্ছে সেই দিকে মুখ করেই নামার নিয়ম—তার উল্টোমুখো নামাটা ঠিক নয়। সেরকম নামলে আছাড় খেতে হয়। উটমুখোরাই উল্টোমুখো নামে। ওভাবে নামতে গেলে টাল সামলাতে না পেরে চিৎপাত হয়ে পড়বেন, ট্রামের তলাতেও পড়তে পারেন—আর সে রকম যদি একবার লটকে যান, কাটা পড়বেন নির্ঘাত! তারপর আর বাতচিৎ নেই। মারা পড়বেন, তৎক্ষণাৎ।'

'তাই নাকি? আমি তো বরাবরই তাই নামি দাদা! রোমাঞ্চিত কলেবরে গোবরা ব্যক্ত করে।

'বলিস কি রে? অ্যাঁ? আর ও রকম করিসনি কক্ষনও। খবর্দার না! উঃ, কী সর্বনাশ! অ্যাদ্দিনে যে কাটা পড়িসনি এই রক্ষে! সাবধান! অমনটা করিসনে। একদিন বাজে খরচা হয়ে যাবি বেবাক!'

'তাই এনতার আছাড় খেয়েছি দাদা! এতদিন আমার ভারী ধাঁধা লাগত, এত লোক নামছে, কেউ খাচ্ছে না, অথচ আমি কিনা নামছি আর খাচ্ছি—খাচ্ছি আর নামছি—খেয়েই যাচ্ছি আকচার! যতই ভাবতাম ততই আরও তাজ্জব হতাম। এখন বুঝতে পারছি কেন!'

'তবেই বোঝ বাউস্কয়েটরা উপকারী কি না। আমি ছেলেটাকে বললাম, তুমি আমায় বাঁচিয়ে দিলে ভাই, ভারী বাধিত হলাম। কিন্তু আমি যখন উল্টোমুখো হয়ে নামছিলাম, উটমুখোর মতন, তখন তো তুমি আমার পাশেই দাঁড়িয়ে। তখন আগেই আমায় বারণ করে সাবধান করলে না কেন?'

'তারপর? তারপর?' গোবরা যার-পর-নাই অস্থির। রুদ্ধনিশ্বাসে দাদার জবাবের অপেক্ষায়।

'ছেলেটা বলল, আমার তো এখানে নামবার কথা নয়। কিন্তু আপনাকে উল্টোমুখো দাঁড়াতে দেখেই আমি উঠে পড়েছি। তখনই জেনেছি যে বেকায়দায় আপনি নামবেন। বারণ করিনি এই জন্যে যে যদি আপনি পড়ে ট্রামের চাকার তলায় গিয়ে কাটা পড়েন তখন আপনাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার সুযোগ পাব। তখন আরও কত, কত বেশি আরও উপকার করতে পারব আপনার।'

'বাঃ! বাঃ! সত্যি ভারী উপকারী তো ছেলেটা। আর সব ছেলের মতন নয়।' গোবরা তারিফ করে তার।

'বয়স্কয়েট বলছে কেন তবে! আর সব ছেলের মতো দুষ্ট আর ফাজিল নয়। তাদের মতন অনুপকারীও না—এ-সব ছেলের ঢের ঢের উপকারিতা।'

'পেয়ারার মতোই পেয়ারের।' ভাই সায় দেয় দাদার কথায়।

হর্ষবর্ধন সহর্ষে গোঁফে চাড় দেন—'টম্যাটোর মতোই এরা হিতকর। পাঠ্য বইয়ে গোরুর রচনার পাশেই এদের স্থান দেওয়া উচিত।'

'টম্যাটোর মতোই হজমি আবার! যা বলেছ দাদা।' ভাবাবেগ গোবরা হিমশিম খায়—'হজম হয়ে যাবার পক্ষে খুব সাহায্য করে। তাই না দাদা?'

'যা বলেছিস! যমের মুখে এগিয়ে দিয়ে ফিরিয়ে আনে আবার। সহজ কাজ কী? একি সামান্য উপকার? আমি ঠিক করেছি, আমিও একটা স্কাউবাউট হব। যাকে পাব, ধরতে পারব যাকে—ধরে বেঁধে তার উপকার করে ছাড়ব! পারব না করতে? তুই কি বলিস?'

'কিন্তু বাউস্কাউটের মতন পোশাক চাই যে। সে পোশাক কই তোমার?'

'নাঃ। সে খাটো হাফ প্যান্ট কি আমার গায়ে আঁটে কখনও? সে পোশাকে আমার পোষাবে না ভাই! মার্কামারা স্কাউবয়েট নাই হলাম, এমনিই কি লোকের উপকার করা যায় না? করলে কী হয়? তাই করব আমি আজ থেকে। করলে আটকাচ্ছেটা কে?'

।। চার ।।

পরদিন সকালে হর্ষবর্ধন ভারী ভাবিত হয়ে ঘুম থেকে উঠলেন। কিংবা ঘুম থেকে উঠেই ভাবনায় পড়লেন তাও বলা যায়।

আজ থেকেই তিনি বিশ্বজনের উপকারে লাগবেন—লেগে যাবেন—পরোপকারী হয়ে পড়বেন আজ থেকেই। এই দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়েই তিনি ঘুম থেকে উঠেছেন। উঠে পড়ে লাগবেন এর পরই। কিন্তু কি করে লাগা যায় সেইটেই হচ্ছে ভাবনার।

বিশ্ব-মানবের যদ্দুর ভালো করবার তিনি করবেন, তার জন্যে যদি নিঃস্ব হতে হয়, ফতুর হতে হয় তাও স্বীকার, তবু তিনি পেছপা হবার নন। হার মানবেন না কিছুতেই। একদম মরিয়া।

এই সময় ছেলেটাকে কাছে পেলে দেখতে পেলে ভালো হত। কী উপায়ে পরোপকার করা যায়, কত রকমে করা যায় তাই নিয়ে পরামর্শ করা যেত—কিন্তু সে কোথায়! হয়তো তার ময়দানের আখড়াতেই এখন।

অগত্যা আপাতত গোবরাকেই ডেকে না হয় আলোচনা করা যাক।

'আরে গোবরা! শোন, এদিকে আয় তো।' হাঁক পাড়েন দাদা—পরোপকার করার কোনও মতলব বাতলাতে পারিস?'

'আঁ?' গোবরা হাঁ হয়ে যায়। এ আবার কেমনতরো কথা? সে গোবেচারীর মতো মুখখানা করে চুপ করে থাকে।

'তুই কখনও কারও উপকার করেছিস?'

'না, কক্ষনও না।' সে ঘোরতর প্রতিবাদ করে—'কখন করলাম?'

'তোর কেউ উপকার করেছে?'

'করতে দিলে তো। ও-সব কাজ আমি কক্ষনও করি না। করতেও দিই না কাউকে ছিঃ! ও কি কেউ করতে দেয় কখনও? করতে আছে? ছ্যা!'

তারপর একটুখানি থেমে সে পুনশ্চ যোগ করে ফের—'ওই সব কাজ কখনও ভদ্রলোকে করে নাকি?'

'কী সব যা তা বকছিস? পরের উপকার করা ভদ্রলোকের কাজ নয়? পরোপকারের মানেই জানিসনে তুই। পরের উপকার করা মানে পরের উপর কিছু করাটরা নয়—পরের ভালো করা সে কাজটা কি খারাপ?'

'তাই বলো! তবে ও-সব উপকারফুপকার আলতুফালতু কথা বলছ কেন?'

'শুদ্ধু ভাষা যে তোর একেবারে বোধগম্য হয় না...বোধগম্য বুঝলি? মানে, তুই যে একেবারে কিছু বুঝিসনে তা আমি কি করে বুঝব?'

'শাদা বাংলায় বললেই বুঝতে পারি। না পারো, আমাদের অসমিয়াতে বললেও বুঝব।'

'বুঝেছি। এখন কথাটা হয়েছে কী শোন। পরের ভালো তো করব, ভালো করেই করব, কিন্তু কি করে যে করা যায় সেই হয়েছে সমস্যা'...

'সমস্যাটা কিসের! প্রথমে দু পয়সার ঘুগনি কিনে খাওয়াও, তারপর চার পয়সার একটা ঘুড়ি কিনে দাও, তাতেও না হয় তো সুতো লাটাই দাও সেই সঙ্গে, তারপরে একদিন সঙ্গে করে সিনেমায় নিয়ে যাও তাকে। রেস্তরাঁয় চপ কাটলেট খাওয়াও...তারপর... তারপর যা চাও...উপকার অপকার যা খুশি করো...যা তোমার প্রাণ চায়। উপকৃত হতে সে আর আপত্তি করবে না, কোনও বাধা দেবে না তোমায়।'

'অত সোজা নয় রে হাঁদা! বলে স্বয়ং বিদ্যাসাগরমশাই পর্যন্ত হিমশিম খেয়েছিলেন পরের উপকার করতে গিয়ে....

'বিদ্যেসাগরমশাই পর্যন্ত এ-কাজ করতেন—অ্যাঁ?'

'করতেন বলে করতেন! করতে করতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছলেন...'

'কার শ্রাদ্ধ করেছিলেন?'

'ভারী মুখ্যু তুই! শুদ্ধু কথা একেবারে কিচ্ছু বুঝিসনে? বীতশ্রদ্ধ মানে হতচ্ছেদ্দা। পরের উপকার করতে করতে এমন করাটাই করলেন যে শেষটায় তাঁর হতচ্ছেদ্দা ধরে গেল।...একটা বইয়ে পড়েছিলাম...'

'কোন বইয়ে?'

'তা আমার মনে নেই। বিদ্যেসাগরমশায়ের জীবনীটিবনী হতে পারে কিংবা হয়তো কারও মুখে শুনেও থাকতে পারি...কে যেন এসে একবার তাঁকে বলেছিল যে মশাই, অমুক আপনার ভারী নিন্দে মন্দ করছে।—যাচ্ছেতাই বলছে আপনার নামে।'

শুনে তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'নিন্দে করছে? একেবারে যাচ্ছেতাই নিন্দে? না, তা হতেই পারে না।'

'হ্যাঁ, মশাই! বেজায় নিন্দে করছে...সবার কাছেই করে বেড়াচ্ছে...। স্বয়ং নিজের কানেও শুনেছি আমি।'

শুনে তো বিদ্যেসাগরমশাই তাজ্জব? বললেন, 'এ তো ভারী অবাক কাণ্ড! অমুক আমার নিন্দে করতে যাবে কেন হে? আমি তো কখনও তার কোনও উপকার করিনি...'

'এই কথা বললেন বিদ্যেসাগরমশাই?' গোবরাও কিছু কম অবাক হয় না।

'বললেনই তো! পরের উপকার করা কি রকম দায়, বোঝ তবেই।'

'কী দরকার করবার! তুমি ও-সব বিচ্ছিরি কাজ করো না দাদা! করতে যেয়ো না কক্ষনও।'

'তা কি হয় রে! পরের উপকার করতে না পারলে জীবন-ধারণই বৃথা! 'জীবন ধারণ'-টা বুঝলি? না, তাও তোর মগজে ঢুকল না! কী মুখ্যু ভাই একটা জুটল যে আমার কপালে! কী পাপ করেছিলাম পূর্বজন্মে...'

'জন্ম তুলে গাল দিও না দাদা! বারণ করছি তোমায়'...

'তোকে গাল দিতে গেলাম কোথায়! আমি তো নিজেকেই দুষছি রে! নিজের বরাতকেই দুষছি! যাকগে...জীবন ধারণ বৃথা মানে, বেঁচে থাকার কোনও মানেই হয় না! পরের জন্যেই আমাদের জীবন, বলল না সেই ছেলেটা?'

'কোন ছেলেটা?'

'সেই কালকের ছেলেটা? বললাম না তোকে কাল? তোর একদম মেমারি নেই, কিচ্ছু মনে থাকে না...'মেমারি' বুঝলি?'

'কেন বুঝব না? বাংলা কথার মানে বুঝব না? শুদ্ধু বাংলায় হল গে স্মৃতিশক্তি।'

'আমি তোর বিস্মৃতিশক্তির তারিফ করছিলাম। কালকের ছেলেটাকে আজকেই ভুলে গেলি রে?'

'পরের ছেলের কথা মনে রাখতে আমার দায় পড়েছে!'

'না রাখলি নাই রাখলি! আমি কিন্তু তার কথা মোটেই ভুলতে পারছি না! তার কথাটা যেমন আমার কানে লেগেছে, তেমনি আমার প্রাণে লেগে রয়েছে...প্রাণের এইখানে...' বলে তিনি নিজের হৃদয় মহাদেশ উন্মুক্ত করে দেখালেন—'সকালে উঠেই আমি প্রতিজ্ঞা করেছি। আজ থেকেই আমি পরের উপকারে লাগব...বদ্ধপরিকর হয়ে। বদ্ধপরিকরের মানে বুঝলি? মানে একেবারে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ করে! হ্যাঁ, সেই হবে আমার একমাত্র কাজ। নইলে এই বেকার জীবন কোনও কাজেরই না। যো পেলে কারু না কারু কিছু না কিছু একটা উপকার করবই করে দেবই!'

'করবেই? করে দেবেই? একেবারে মুক্তকচ্ছ?'

তারপর একটু থেমে সে শুধোয় ঃ 'কথাটা তোমার মগজে ঢুকল তো দাদা? ওর মানে হদ্দমুদ্দ বেপরোয়া। কাপড়চোপড় প্রাণটানের মায়া বিসর্জন করে। একটু শুদ্ধ ভাষায় বলেছিলাম আর কি! মানে, উপকারী হবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছ নাকি? প্রাণ খাঁই খাঁই করছে তোমার?'

ভাইয়ের বক্রোক্তিটা গায়ে মাখেন না দাদা—'কিন্তু উপকার করব যে তার ছুতো পাই কি করে? তাই আমি ভাবছি। ছুতো পাওয়াই তো মুশকিল।'

পরক্ষণেই তাঁকে একটু ভাবিত দেখা যায়—'ভবিষ্যতে এর জন্যে গুঁতো খেতে হবে আমায়, তা জানি। বিদ্যেসাগরকেও ধরে গুঁতিয়ে দিয়েছিল তারা, সেই উপকৃত লোকরা। কিন্তু সে পরের কথা পরে, তার জন্য কোনও পরোয়া করিনে আমি। এখন একটা ছুতো পাওয়া নিয়ে কথা।'

'এই পরোপকার করার জন্যে তারা তোমায় খলখলে করে দেবে, তা কিন্তু বলে রাখছি দাদা...সাবধান!'

'করুক গে মরুক গে।' উনি সে জন্যে কোনও কেয়ার করেন না।

'তাহলে করো গে মরো গে। খলের অবার ছলের অভাব? খলখলের আবার পরোয়াটা কিসের। ছলে বলে কৌশলে যেমন করে পারো ধরে বেঁধে করে দাও গে!'

'উপকার করা দারুণ শক্ত কাজ রে ভাই। ইচ্ছে করলেই হয় না। শক্তি থাকলেই করা যায় না। ভগবান তো সর্বশক্তিমান, তিনিই বলে পারছেন না...'

'পারছেন না?'

'কই আর পারছেন! তিনি তো মঙ্গলময় করুণাময় কত কী! তিনি আবার ইচ্ছাময়ও। তারপর তিনি পরাৎপর, মানে, পরের চেয়েও পর...তাঁর মতন পর আর হয় না। তবুও তিনি পরের উপকার করতে অপারগ। এত শক্তি, এমন ইচ্ছে থাকতেও অপারগ।'

'আমার বিশ্বাস হয় না।'

'ভগবানে তোর বিশ্বাস হয় না।'

'ভগবানে বিশ্বাস হবে না কেন? তোমার কথায় হচ্ছে না, তাঁর ইচ্ছে তাঁর ক্ষমতা থাকতেও তিনি কিছু করতে পারছেন না এ-কথা কি করে বিশ্বাস করা যায়?'

'কি করে করবেন? উপকার করাটা খুব দুঃসাধ্য কাজ যে ভাই! ভগবান ইচ্ছাময় সর্বশক্তিমান হয়েও পারছেন না তাই! নইলে, তিনি থাকতে, পৃথিবীতে এত দুঃখ কষ্ট কেন রে? মানুষের এত দৈন্য এত অভাব কিসের জন্য? স্বয়ং ভগবান সর্বশক্তিমান হয়েও কারও ভালো করে উঠতে পারছেন না কেন? তার মানে ব্যাপারটার কোথাও কোনও গলদ আছে।'

'আছেই তো!' গোবরার জোরালো সায় দাদার কথায়—'কাজটা মোটেই ভালো নয়; সেই জন্যেই।'

'মানে উপকার করার কোনও ছুতো পাচ্ছেন না বলেই। কেউ কিছু ছুতো দিলেই তবেই তিনি কারও একটুখানি ভালো করতে পারেন। ছুতোর মিস্ত্রি হতে পারেন তাহলেই। কিন্তু সেই ছুতোই কেউ তাঁকে দিচ্ছে না।'

'দেবে কেন? দেওয়া কি উচিত?'

'যতই ভাবছি, যতই আমি ভেবে দেখছি, ততই, উপকারের চেয়ে, উপকার করার চেয়েও, করবার ছুতো পাওয়াটাই বেশি কষ্টকর বলে বোধ হচ্ছে আমার।' ঘাড় নাড়তে থাকেন দাদা।

'ঘাড় নড়ে ভাইয়েরও—'কাজটা তো কষ্টকর বটেই! যে করে আর যার করা হয় দুজনের পক্ষেই দারুণ। মোটেই আরামের কাজ নয়।'

'তোকে বলেছে! ও-সব কথা আমি শুনব না! বিদ্যেসাগরমশাই যদি শেষটায় পিছিয়ে গিয়ে থাকেন গেছেন। আমি কিন্তু পেছপা হবার ছেলে নই। পরোপকার আমি করবই, যাকেই নাগালে পাব, বাগাতে পারব, তার হাতে পায়ে ধরেই হোক কি গলায় পা দিয়েই হোক, উপকারটি না করে আমি ছাড়ছি না, নড়ছি না সেখান থেকে। একেবারে নাছোড়বান্দা। আজ থেকে এই হল আমার নিত্যকর্ম। জীবনের ব্রত।'

'কী সর্বনাশ!' গোবরা সভয়ে দাদার দিকে তাকায়।

'আচ্ছা, বাড়ির থেকে হাতেখড়ি হলে কী হয়?' দাদা শুধান, 'যদি নিজের বাড়ির প্রতিই প্রথমে আমি উপকারী হই?'

'বাড়ির আবার তুমি কী উপকার করবে? পাচ্ছ কাকে বাড়িতে?'

'কেন, তোকে? তুই তো হাতের পাঁচ, হাতের নাগালে এমন আপন ভাই আমি থাকতে কেন বাইরে যাই? বাইরে গিয়ে পরের খোঁজাখুঁজি করার, ছলছুতো খুঁজে বেড়াবার দরকারটা কী আমার?'

'ছিঃ! ভাইয়ের উপকার কি করতে আছে? সেটা যেন কেমন ধারা। শুনিও নি কখনও এমন কথা যে ভাই হয়ে ভাইয়ের উপকার করছে।'

'শুনবি কি করে? ভাইয়ে ভাইয়ে শত্রুতা যে! আমার মতো উপকারী ভাই তো নয় সবাই। আমি ভাবছি তোর থেকেই শুরু করা যাক...তোর উপকার করার থেকেই আমার হাতেখড়ি হোক না!'

'তা কি হয় দাদা! আমি তোমার মায়ের পেটের ভাই নাকি? লোকে শুনলে বলবে কী তোমায়?' আঁতকে ওঠে সে।—'কথায় বলে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।'

'কান দিসনে লোকের কথায়। রেখে দে সে-সব কথা। তুই নিজের ভাই হয়ে যদি করতে না দিস তো পরের ভাইরা দেবে কেন রে? যা একটা চেলা কাঠ নিয়ায় গে। বেশ মোটা সোটা দেখে আনিস কিন্তু।'

'আনলে?'

'আনলেই টের পাবি।' রহস্যময় হাসি দাদার মুখে।

'চ্যালা কাঠ কী হবে দাদা?' জানতে চায় তবুও।—'গুরুদেরই তো চ্যালার দরকার হয়। তুমি তো কারও গুরু নও।'

'তোর গুরুজন না আমি? নিয়ায় চ্যালা কাঠ বলছি!' হাঁক পাড়েন দাদা—'হাতে নাতে দেখিয়ে দেব এক্ষুনি! এনে দেখ! আন না।'

'না, বলো আগে।'

'মানে, ধর, তোকে যদি আমি আজ থেকে পিঠে করে বয়ে নিয়ে বেড়াই সেটা কি তোর খুব উপকার করা হবে না?'

'আমাকে? পিঠে করে? কেন, পিঠে কেন?' সে বলে ঃ 'পিঠে করে খাওয়াতে পার। কিন্তু পিঠে করে বেড়াতে যাবে কেন গো?'

'বাঃ, চলতে ফিরতে তোকে তাহলে কোনও বেগ পেতে হয় না। হাঁটাচলায় কত না কষ্ট হয় তোর। ভেবে দেখ সেটা। ধর, তার বদলে কেউ যদি তোকে কাঁধে করে নিয়ে বেড়ায় মন্দ কি?'

ভালোমন্দটা মনে মনে খতিয়ে দেখে গোবরা।

'কেন, তোর মানে নেই রে, ছোটোবেলায়, মানে আমার নয়, তোর ছোটোবেলাতেই কত আমি তোকে কোলে পিঠে নিয়ে বেড়াতাম। কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি তোকে। মনে নেইকো তোর?'

'না তো।'

'থাকবে কি করে—তোর যা বিস্মৃতিশক্তি! গতকালের কথাই তোর মনে থাকে না আজ, আর কত কালের কথা মনে থাকবে!'

'তা, মনে না থাকলেও এটা কিছু অসম্ভব নয়। হতেও পারে, হয়েও থাকে হয়তো। তবে বুঝেছ দাদা, যে দাদারা কিনা ছোটোবেলায় ভাইকে কোলে করে নিয়ে বেড়ায় তারাই একটু বড় হলেই সেই ভাইকে ধরে ঠেঙাতে কসুর করে না। গোড়ায় তোমার পিঠটি দেওয়ার পরে তুমি যে আমাকে ধরে অনেক পিটটি দিতে তা আমি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি, এখনও সে-সব আমার মনে আছে বেশ।'

'ভুলে যা ভুলে যা। ভুলে যা সে-সব কথা। আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছি এখন। তোকে কোলে করতে পারব না। অত বড় ধাড়ি ছেলেকে কোলে করে রাখা শক্ত হবে বোধহয়...তবে কাঁধে করে নিয়ে বেড়াতে পারব নিশ্চয়। তাই করব আজ থেকে...'

ভাইকে চুপ করে থাকতে দেখে উসকে দেন দাদা—'কি করে, বল না! কাঁধে চাপবার শখ হয় না তোর?'

'শখ তো হয়, কিন্তু...' বলে সে ফের চুপ মেরে যায়। বড় ভাইয়ের সঙ্গে এতখানি সখ্যতা করা উচিত হবে কি না তাই বুঝি সে খতিয়ে দেখে।

'কিন্তু এই বুড় বয়সে দাদার কাঁধে চেপে বেড়ালে লোকে কী বলবে আমায়, তাই আমি ভাবছি।'

'লোকের কথা ছাড়ান দে! তোর ইচ্ছে করে কি না তাই বল।'

'এক আধ দিন একটু আধটু হলে মন্দ হয় না হয়তো। কখনওসখনও একটুখানি তোমার কোলে কি পিঠে চাপতে আমি রাজি আছি।'

'একটুখানি নয়, এক আধ দিন না, বরাবর। চিরকালের জন্য তুই আমার পিঠে পিঠে থাকবি। তুই আমার পিঠোপিঠি ভাই না? ...তাই তো চ্যালা কাঠ নিয়াসতে বলছি তোকে।'

'চ্যালা কাঠ দিয়ে কী হবে দাদা?'

'ঠাঁই ঠাঁই করে লাগাব তোকে। চ্যালা কাঠ দিয়ে ঠেঙিয়ে তোর ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব।'

'কও কি দাদা? ঠাঁই ঠাঁই করে লাগাবে আমায়?' শুনেই গোবরা আঁতকায়।

'তবে কি? ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই বলেছে না? সেই জন্যেই তো আনতে বলছি চ্যালাকাঠ।'

'জন্মের মতো খোঁড়া করে দেবে আমায়?'

'করবই তো। তা নইলে পিঠে করে বইব কি করে? লোকে বলবে কী তাহলে? বুড় ভাইকে, এমন ধেড়েকেষ্ট ছেলেকে কি কোলে পিঠে করে কেউ বেড়ায় কখনও? কিন্তু খোঁড়া নিয়ে বেড়ানো যায়। ধন্য ধন্য করবে সবাই।'

গোবরা কিন্তু দাদাকে ধন্যবাদ দিতে পারে না—'না দাদা তা হয় না।'

'না হলে কি করে হবে? আগে তোকে খোঁড়া করে তারপরে তোকে পিঠে করলেই তো উপকার করা হবে তোর। তার নাম পরোপকার, তাকেই বলে মহানুভবতা। মানে বুঝতে পারলি এবার?

'হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। রক্ষে করো দাদা!'

'তুই না আনিস আমি নিজেই নিয়ে আসছি না হয়। উনুনে কালকের পোড়া কাঠটাট কিছু পড়ে আছে কি না দেখি গে।'

'পোড়া কাঠ দিয়ে তোমায় আর মহানুভবতার পরাকাষ্ঠা দেখতে হবে না দাদা! ছেড়ে দাও আমায়, কেঁদে বাঁচি।' বলেই সাত হাত সে পিছিয়ে যায়।

'আরে পালাচ্ছিস কেন—ভয়টা কিসের!'

'ভরসাটাই বা কি দাদা? আমি আর তোমার ত্রিসীমানায় নেই, সাত জন্মে নয়। চ্যালা কাঠেরও দরকার হবে না তোমার, কাছে পেলে আমায় জাপটে ধরে তোমার ওই গোদা পায়ের ঠেঙানি দিলেই আমার ঠ্যাং-এর দফা রফা!'

'ভয় খাচ্ছিস আমায় তুই?'

'খাবো না? তুমি যে অ্যাদ্দূর পরোপকারী হয়ে উঠবে তা ধারণাই করা যায় না। ভয়ের কথা নয়? সারা জন্ম তোমায় এড়িয়ে এড়িয়েই চলতে হবে এখন থেকে।'

'বয়েই গেল আমার। তুই না উপকৃত হতে চাইলে বুঝি আর আমার উপকার করা হবে না? তাই বুঝি তুই ভেবেছিস? আমি বিশ্বজনের উপকার করে বেড়াব, নিঃস্ব হয়ে যাব। ফতুর হয়ে যাব উপকার করতে করতে।'

'করো গে, আমি ভয় খাই না।'

'আমার সব টাকাকড়ি উড়িয়ে দেব, কিচ্ছুটি রাখব না তোর জন্যে! পরকে বিলিয়ে দেব সব। উপকার করতে দিলিনে যেমন, চরম অপকার করে ছাড়ব তোর। পথে বসাব তোকে।'

'থোড়াই কেয়ার করি। আমার হাত পা যদি বেঁচে-বর্তে থাকে খেটে খেতে পারব আমি। তোমার যা খুশি করোগে।'

'করবই তো! এই আমি আমার দু-পকেট ভর্তি করে টাকাকড়ি নিয়ে বেরুচ্ছি। বাড়ির থেকেই শুরু করব ভেবেছিলাম, তুই হতে দিলিনে। বাইরেই যাই, করিগে। করব কী?'

'তাই যাও দাদা। বাড়িতে নাই বা করলে। বাড়াবাড়িটা বাইরে বাইরে করাই ভালো।...'

বাড়ির থেকে হুড়মুড় করে বেরুতেই কাঞ্চনের সঙ্গে প্রায় ঠোকাঠুকি লেগে যায় তাঁর...

'এই যে স্কয়বাউট! কোথায় যাচ্ছ ভাই?'

'যাব কি? এলাম তো! আসতে বলেছিলেন না আপনি?'

'ও, এসেছ বুঝি? তা বেশ করেছ, কিন্তু আমি বেরুচ্ছিলাম যে...'

'কোথায় যাচ্ছেন এখন? এই সাত সকালে? সাতটাও বাজেনি প্রায়...'

'তোমার কথামতোই বেরিয়েছি...বিশ্বের উপকারে বেরিয়ে পড়েছি...'

'বেশ বেশ। কিন্তু প্রথমেই বিশ্বসুদ্ধু টান কেন? বাড়ির থেকেই তো শুরু করতে হয় সব। চ্যারিটি বিগিন অ্যাট হোম—বলেছে না?'

'তাই তো করতে চেয়েছিলাম ভাই রে! কিন্তু আমার আকাঠ মুখ্যু ভাইটা হতে দিল কই? পালিয়ে গেল যে...কি করব?'

'পালিয়ে গেল? উপকারের ভয়ে পালিয়ে গেল, বলেন কি?'

'তবে আর বলছি কি ভাই স্কয়বাউট।'

'স্কয়বাউট নয়, বয়স্কাউট। বার বার স্কয়বাউট স্কয়বাউট করছেন কেন আমায়? বয়স্কাউট শোনেননি নাকি কখনও?'

'শুনব না কেন? তোমার কাছেই তো শুনলাম। কালকেই শুনেছি...এর আগেও শুনেছিলাম যেন কোথায়।'

'তবে? মানে জানেন না বুঝি কথাটার?'

ভেবেছিলাম...মানে, আগে যখন শুনেছিলাম তখন আমার মনে হয়েছিল যে উটরা বুড় হয়ে গেলে...উট কাকে বলে জান তো?'

'কেন জানব না? পড়েছি তো বইয়ে। কুব্জ দেহ ন্যুব্জ পৃষ্ঠ সারি সারি উট। চালকের ইঙ্গিত মাত্রই দেয় ছুট...পড়েছি সেই কবে!'

'সেই উটরা বয়সে বেড়ে উঠলে, মানে বুড় হলে তাদের বলে বয়স্ক উট, আর তাদের বউদের মানে উটবুড়িদের বলে থাকে বয়স্কা উট। বয়স্কাউটের তাই মানে আমি ভেবেছিলাম।'

'বয়স্কাউট মানে বয়স্কা উট?' হতবাক হয় কাঞ্চন।

'তবে যদি কোনও বর্ষিয়সী উটমুখো হয়ে রাস্তায় হাঁটে তাকেও ও-কথা বলা যেতে পারে বোধহয়।'

'তা নয় মশাই, মোটেই তা নয়। তার মানেটা যে কী'...কাঞ্চন নিজেও তা ঠিক জানে না, তাই সে চুপ করে যায়।

'তা যে নয় তা আমি বুঝতে পেরেছি। তোমাকে দেখেই টের পেয়েছি। তুমি তো আর উট নও। বয়স্ক তো নও-ই! তবে কিনা বয়স্কাউট না বলে কি আর বলা যায় বল!'

'কেন আমার নাম ধরে ডাকুন। আমার নাম কাঞ্চন। ভুলে গেলেন এর মধ্যেই?'

'না না ভুলব কেন? মনে পড়েছে। কাঞ্চন, আর তার সঙ্গে আরও কত কী যেন বলেছিলে। গুলিয়ে গেছে তাইতেই।'

'আমি এলাম আপনার কাছে। আপনি আবার বেরিয়ে পড়লেন এখন!'

'বেশ তো, ভালোই তো হল। দু জনে একসঙ্গে বেরুই না কেন?...একজোটে সবার উপকার করা যাকগে। তোমার নামের যেমন অনেকগুলো মানে হয়, আমারও সেই রকম, বুঝলে কাঞ্চন?'

'কি রকম?'

'এই যেমন, আমার নাম তো হর্ষবর্ধন? এমন হর্ষ মানে আনন্দও হয়, ঘোড়াও ফের হয় আবার। হর্স মানে ঘোড়া, যে ঘোড়া ঘাস খায়। আর বর্ধন কিনা বার্ডেন, বার্ডেন মানে বোঝা, বুঝেছ? মানে কিনা, আনন্দের বোঝা!'

নিজের বোঝাটা তিনি কাঞ্চনের মাথায় বোঝাই করতে চান।

'বুঝেছি।'

'তাছাড়া আমার টাকা আছে এনতার। তোমার টাকা নেই। তুমি ছেলেমানুষ। কোথায় পাবে টাকা? কিন্তু টাকা না হলে কি কারও উপকার করা যায়? আমার অঢেল টাকা। এই দেখো না, দু-পকেট বোঝাই করে কত টাকাকড়ি নিয়েছি...'

'আসুন তাহলে পরোপকারে লেগে পড়া যাক...' দেখে শুনে সে বলে।

'কাঞ্চন, বুঝলে কিনা, ভাই! তুমি হলে কাঞ্চন আর আমি হচ্ছি money; আমাদের দু-জনে মিলে মণিকাঞ্চন যোগ হল এতদিনে। পরস্পরের অভাব মোচন হল। চলো এবার বেরিয়ে পড়া যাক...যেদিকে দু-চোখ যায়...উপকার করার মতো কাউকে পাওয়া যায় কিনা দেখা যাক!'

।। পাঁচ ।।

'বাব্বা! যা তীরবেগে বেরুলেন বাড়ির থেকে...আরেকটু হলেই আপনার সঙ্গে আমার কলিশন বেধে যেত। খুব সামলে নিয়েছি।' বলে হাঁপ ছাড়াল কাঞ্চন।

'বেরুব না? বেজায় তিতবিরক্ত হয়েই বেরিয়েছি। আমি বিবাগী হয়ে যাব।' হর্ষবর্ধনও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন—প্রায় ইস্টিশন ছাড়া ইঞ্জিনের মতোই। সৃষ্টিছাড়া দীর্ঘনিশ্বাস।

'হয়েছিলটা কী?'

'তুমি এখনই যা বললে না? বাড়িতেই সে চ্যারিটি শুরু করতে গেছলাম—কিন্তু সূত্রপাতেই যা ধাক্কা খেলাম একখানা। বলে কি না, বাড়াবাড়িটা বাইরে গিয়ে করলেই কি ভালো হয় না দাদা?'

'কে বললল এ-কথা? বউদি?'

'কে বলবে আর! আমার ভ্রাতাজীবন—শ্রীমান গোবর্ধনচন্দর। আবার কে? অমন আহাম্মক তো দুটো নেই দুনিয়ায়। এমন কি, ওকে কাটলে দু-খানা গোরু হয়।'

'কিন্তু চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম বলেছে যে বইয়ে? সেটা কি তবে মিথ্যে কথা?'

'বললে কী হবে? তা কখনও হয় না। তা যদি হত তাহলে লোকে আপনার জনকে ছেড়ে কখনও পরকে পাকড়াতে যেত না...'

'শাস্তরেও বলেছে নাকি যে আত্মপরভেদ করতে নেই, বাবা বলেন।' কাঞ্চন পিতৃবাক্য স্মরণ করে।

'আমিও জানি। আপনার মতন পর আর হয় না! যে আপনার সেই পর, যে পর সেই আপনার—সবার উপর যিনি পরাৎপর আবার, তিনি সাক্ষাৎ ভগবান। বিলকুল পরম্পৈপদী...পরের নিয়েই রয়েছেন। কিন্তু হলে কি হবে, আমি তো বাড়ির উপকারী হতেই গেছলাম হে। হতে দিল কই? এখন বুঝতে পারছি কেন মানুষ কোন দুঃখে পরোপকারী হয়ে যায়...বাধ্য হয়ে ছিটকে পড়ে বাইরে।' দুঃখ করেন হর্ষবর্ধন।'

'ভাইয়ের উপকার করতে গেছলেন?' শুধাল কাঞ্চন, 'উপকৃত হতে চাইল না বুঝি সে?'

'বললাম যে আয় গোবার, তোকে একটু পিঠে করে নিয়ে বেড়াই। তা সে বলে কি না, আমাকে কেন দাদা? আমার তো হাত-পা আছে। হাঁটতে পারি বেশ। বাজারে কত কানাখোঁড়া পাবে, তাদের বোঝা বয়ে বেড়াও গে না।'

'ঠিক কথাই বলেছে তো।' তার সমর্থন করে কাঞ্চন, 'আসল জিনিস ফেলে নকলের পেছনে দৌড়চ্ছিলেন কেন? যদি সত্যিই আপনার পীঠস্থান কাউকে দিতে চান তবে সত্যিকার কানাখোঁড়া কাউকেই তা দান করুন।'

পীঠস্থানের উল্লেখে হর্ষবর্ধন গুম হয়ে যান, খানিক আগের ঘটনাটা তাঁর স্মরণপথে উদিত হতে থাকে...

গোবরাকে তিনি বলেছিলেন, 'পরের পিঠে চেপে বেড়াতে তোর কেমন লাগে রে? ইচ্ছে করে না চাপতে?'

'চেপে দেখিনি তো কখনও।' জবাব দিয়েছে গোবরা, 'বলতে পারি না ঠিক, কেমন লাগবে। তা এক রকমের মজাই হবে হয়তো।'

'বেশ, আজ থেকে তোকে যদি আমি পিঠে বয়ে বেড়াই, দিনরাত তুই আমার পিঠে পিঠেই থাকবি। (পিঠোপিঠি ভাই বলেই তাঁর এই দাবিটা ছিল নাকি, এবং তিনি আরও লোভ দেখিয়েছিলেন ওকে...) বড় বড় দেবতার যেমন পীঠস্থান থাকে, তেমনি আমার পিঠ-স্থানে তোকে প্রতিষ্ঠিত করব। দেবতুল্য হয়ে যাবি তুই। কেমন হবে বলত?'

তা সে বলে কিনা...এতখানি দেবত্বের প্রলোভনেও তাকে তেমন প্রলুব্ধ দেখা যায় না। আপত্তির সুর তোলে সে...'কিন্তু...কিন্তু সেটা কি খুব ভালো দেখাবে দাদা?'

'কেন, মন্দটা কি দেখাবে শুনি?'

'এক আধটু মাঝে মাঝে চাপতে পারলে মন্দ হয় না হয়তো...কিন্তু দিনরাত...নিজের হাত-পা থাকতে...।' গাঁই গুঁই করে সে তবুও।

'হাত পা থাকতে দিচ্ছি কোথায়? চ্যালা কাঠ আনতে বলছি না তোকে?' তিনি বাতলেছেন—'চেলিয়ে আগে তোর হাত পা ভাঙব, তারপর তো পিঠে করে নিয়ে বেড়াব তোকে। আগে তুই খোঁড়া হবি তারপর না? পা-ওয়ালা কাউকে পিঠে বয়ে নিয়ে বেড়ানো যে ভালো দেখায় না সেটা আমিও বুঝি। সেটা তেমন দয়ালুতাও

হয় না। খোঁড়া মানুষকে যে পিঠে তুলে নেয় সেই তো আসল দয়ালু...আর যে পরের গলগ্রহ হয়ে সর্বদা পরের পিঠে চেপে বেড়ায়, সেই তো সত্যিকারের পৃষ্ঠপোষক...।'

কিন্তু গোবরা কারও পৃষ্ঠপোষকতা করতে চায় না, কাউকে, এমন কি সে আপন দাদা হলেও, তাকে পরোপকারী হবার সুযোগ দিতে নারাজ...খোলা বাজার দেখিয়ে দিয়েছে সোজা...

'কী এত ভাবছেন?'

হর্ষবর্ধনকে নীরব দেখে কাঞ্চন শুধায়।

'গোবরার কথাটাই ভাবছিলাম।' দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে তাঁর।

'ভাইয়ের কথাটা তো ঠিকই মশাই! দুনিয়ায় কি কানা খোঁড়ার কোনও অভাব আছে? খাঁটি জিনিস বাজারে মিলতে আপনি ভেজালের ভেতর যাবেন কেন?'

'খাঁটি জিনিস আর পৃথিবীতে নাই রে ভাই! অন্তত তোমার আমার এই কলকাতায় তো নেই। সব ভেজাল এখানে...কানা খোঁড়াও সব...ভেল। চোখের ওপর ভেলকিবাজি কেবল।'

তারপর তাঁর দ্বিতীয় প্রস্থ দুঃখকাহিনী শুরু হয়...

'তাহলে বলি শোনো। আমাদের কলকাতায় আসার গোড়াকার কথা বলি তোমায়...আমরা তো আসামের লোক, সেখানেই আমাদের আসল ব্যবসা। সেখানকার জঙ্গল ইজারা নিয়ে কাঠ কেটে চালান দিতাম কলকাতায়। গাছপিছু কেনা পড়ত একটাকা দেড়টাকা করে। গাছ কেটে তার ডালপালা ছেঁটে পাঠাতাম—লাভ হত গাছ পিছু গড়ে একশো টাকা করে । তাইতেই আমাদের এত টাকা জমে গেল যে রাখবার ঠাঁই পাই না...।'

'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী—বলেছেই তো!' কাঞ্চন সায় দেয় তাঁর কথায়।—'তবে টাকা রাখবার জায়গা পেতেন না সে কেমন কথা!'

'চোর ডাকাতের ভয়ে মাটিতে পুঁতে রাখতে হয়। আমাদের জঙ্গলের গাছের গোড়ায় পুঁতে রাখতাম টাকা। রাখতে রাখতে সব গাছের গোড়াই টাকায় ভর্তি হয়ে গেল—রাখবার আর জায়গা পাই না....তখন গোবরা বলল, দাদা, বিস্তর টাকা জমানো হয়েছে, এবার চলো, কিছু না হয় ওড়ানো যাক...।'

'বলল বুঝি আপনার ভাই?'

'বললই তো। আমিও ভাবছিলাম কথাটা। বললাম, দে উড়িয়ে। গোবরা চেষ্টা করল বটে, হদ্দমুদ্দ চেষ্টা করল সে, কিন্তু টাকারা উড়বার পাত্র নয়...।'

'উড়ল না একদম?'

'কই আর উড়ল? যতবারই আকাশের দিকে ছুড়ে দেয় ততই ফিরে মাটিতে এসে পড়ে। প্রায় সেখানেই বা তার কাছাকাছি। টাকার পাখা গজায়, বলে থাকে যে কথায়, তা বিলকুল ভুল...স্রেফ বাজে কথা।'

'মাধ্যাকর্ষণের জন্যই এমনটা হয়—বুঝেছেন?' কাঞ্চন ব্যক্ত করে।

'আমি তখন বললাম, টাকা উড়বার জিনিস নয় রে ভাই! তবে যদি ছোটো বড় মাঝারি নোট হয়....আর তেমন তেমন ঝড়ের মুখে ছাড়া যায় তাহলে এক-একখানা নোট একশো মাইল পর্যন্ত উড়তে পারে হয়তো। কিন্তু ঝড় কোথায়! ঝড় তো আর আকচার হবার নয়। তখন গোবরা বলল, চলো দাদা, আমরা কলকাতায় যাই। কলকাতা শুনেছি চমৎকার টাকা ওড়াবার জায়গা। তারপরেই আমরা কলকাতায় চলে এলাম...এখানে এসে কাঠচেরাইয়ের কারখানা খুললাম আমরা একখানা...এই চেতলায়।'

'টাকা ওড়ালেন খুব?'

'কই আর পারলাম ওড়াতে! আগে আমরা অপরের কারখানায় কাঠ যোগাতাম, এখন হল কি, নিজেদের কারখানায় জনমজুর লাগিয়ে করাতে কাঠ চিরে তক্তা বানাতে লাগলাম...এক একটা গাছকে তক্তা করে হাজার হাজার টাকা মুনাফা হতে লাগল।'

'সর্বনাশ!'

'সর্বনাশ বলতে! টাকা ওড়াব কি, টাকা আরও জমতে লাগল। তারপর সেই সব চেরা তক্তার থেকে আমরা নানান আসবাব-পত্র বানাতে শুরু করে দিলাম। খাট, পালঙ্ক, চেয়ার, টেবিল, দেরাজ, দোলনা, আলনা, আলমারি নানান জিনিস। তখন এক টাকার গাছ দশ হাজার টাকায় দাঁড়তে লাগল...জমে জমে টাকার পাহাড়!'

'কোথায় রাখলেন অত টাকা। এখানে তো টাকা পুঁতবার মাটি মেলা মুশকিল।'

'টাকা রাখার কোনও ভাবনা নেই এখানে। ব্যাঙ্ক আছে। কিন্তু যে জন্যে কলকাতায় আসা সে উদ্দেশ্য আমাদের সিদ্ধ হল না। ব্যর্থ হল সব। কলকাতা যে টাকা উড়াবার জায়গা নয়, উল্টে টাকা কুড়াবার জায়গা...এখানকার পথে-ঘাটেই টাকা ছাড়ানো, কুড়িয়ে নেওয়ার অপেক্ষা কেবল...তা আমরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি ভাই।'

'ইচ্ছে করলে ওড়ানো যায় না নাকি? খুব ওড়ানো যায়।'

অবিশ্বাসীর মতোই ঘাড় নাড়ে কাঞ্চন। 'কলকাতায় কত ভিখিরি, কানা-খোঁড়া কত না, তাদের দিয়ে দেওয়া যায় নাকি। হাজার হাজার লোক শুয়ে থাকে ফুটপাতে...রাত্তিরে বেরিয়ে দেখবেন রাস্তায়—তাদের বিলিয়ে দিলেই হয়—এক দিনেই এক রাত্তিরে অনেক টাকা খরচা করা যায় তাহলে।'

'একবার একটা খোঁড়া ভিখিরি এসেছিল বটে দরজায়। তাকে দেখে কিছু আশার সঞ্চার হয়েছিল। ভাবলাম এবার হয়তো কতক টাকার সদগতি হবে। তাকে একশো টাকার একখানা নোট দিতেই সে বললে, আমার কাছে এর ভাঙানি আছে বাবু! বলে নিজের গেঁজিয়া খুলে নিরনব্বই টাকা ফিরিয়ে দিতে এল আমায়। বলল, একটা টাকা তো দিতে চান আপনি? এই নিন আপনার বাকি টাকা ফেরত। দেখে তো আমি অবাক! এই টাকাটা তোমার কত দিনের রোজগার হে? সে বলল, এক রোজের কামাই বাবু! চৌরঙ্গি মহলায় একবেলা এক চক্কর খুঁড়িয়ে টহল দিলেই এই টাকা এসে যায়। সাহেবলোগ দু-পাঁচ টাকার কম দেয় না বাবু! আমি দেখলাম, বাববা! এখানকার ভিখারিরাও বেশ বড়লোক। মরার পর একেক জনের বালিশের ভেতর থেকে যে হাজার হাজার টাকা পাওয়ার খবর পেতাম কাগজে, সেটা তাহলে ভূয়ো নয়। তখন আমি বললাম, ভাঙানি তোমায় দিতে হবে না বাপু, সবটাই তোমার। তখন সে একটু অবাক হল বটে। কিন্তু বিশেষ নয়। আমি তাকে সান্ত্বনাছলে বললাম, ভগবানকে ধন্যবাদ দাও ভাই, তিনি তোমাকে শুধুই খোঁড়া করেছেন—কানা করলে কী কষ্টটাই না হত তোমার। সে বললে, যা বলেছেন বাবু! আগে তো কানাই ছিলাম আমি। পথের ধারে কোণটিতে বসে ভিক্ষে করতাম। তখন বাবুরা যত অচল আনি দু-আনি চালিয়ে যেত আমায়...তাই বাধ্য হয়ে আমায় খোঁড়া হতে হল শেষটায়...এখন আমার উপায় হয় বেশ। আপনার ওই পাওয়ালাদের চেয়ে বেশিই হয় বাবু।'

শুনে তো ভাই আমি হতবাক! বাবা, বলে কী এ! পায়াভারি পদস্থদের চেয়েও এর রোজগার ভারি? ভগবান তাহলে একে শুধুই খোঁড়া করলেও শুধু শুধু খোঁড়া করেননি। খোদাকে আমি আবার ধন্যবাদ জানাই।

এমন সময় হল কি, শোনো! খোদার ওপর খোদকারি ছিল আরও। দেখতে পেলাম একটু পরেই। একটা ষাঁড় যাচ্ছিল রাস্তা ধরে, ভিখারিটাকে দেখে তার কেন যেন গোঁসা হল কে জানে, শিং নেড়ে এগিয়ে এল তার দিকে...দেখেই না খোঁড়াটা হাতের লাঠি ফেলে দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে ভোঁ দৌড়! এক লহমার মধ্যে অন্তর্ধান....।'

'লোকটা তাহলে খোঁড়া ছিল না আদপেই?'

'গোড়ায় যেমন কানা ছিল অবিকল সেই রকমেরই খোঁড়া—বুঝেছ? বলছিলাম কি তবে? কলকাতায় খাঁটি জিনিস দুর্লভ। এখানে চালে, ডালে, তেলে, ঘিয়ে, দুধে, ওষুধে সব কিছুতে ভেজাল...তোমার কানা খোঁড়ারাও সব ভেজালে ভর্তি। যাবে কোথায়?'

'চলুন শহরের বাইরে চলে যাই। একটা বাস ধরে যাওয়া যাক...শহরতলিতে সত্যিকারের অভাবী এমন লোকের দেখা মিলতে পারে যারা উপকৃত হবার অপেক্ষায় রয়েছে...'

'যারা আমাদের উপকার করতে দেয় আসলে তারাই আমাদের উপকার করে। আমাদের অর্থভার মোচন করে মনের বোঝা হালকা করে দেয়...সত্যি বলতে, উপকৃত হয়ে উল্টে আমাদেরকেই কৃতার্থ করে তারা...নইলে, ভেবে দেখো তুমি, এই যে আমাদের জীবন...' হর্ষবর্ধন হঠাৎ যেন দার্শনিক হয়ে ওঠেন ঃ 'একে কি আর জীবন বলা যায়? দিনরাত খালি ভাত আর মাছের ঝোল, মাছের ঝোল আর ভাত...আর মাঝে মাঝে তাই হজম করতেই সোডি-বাই কার্ব...দুর দুর! একে কি আর জীবন বলে! এভাবের জীবন যাপন করতে প্রাণ যে যায় যায় হবে, ভাত হজম করাই দায় হয়ে দাঁড়াবে, সে আর বেশি কি? সমস্ত অস্তিত্বই যে অম্বল হয়ে ওঠে না তাই আশ্চর্য! একান্ত নিঃস্বার্থ হয়ে পরের জন্যে যে প্রাণান্ত করে...'

'নিজের প্রাণান্তই অবশ্যি।' মাঝখান থেকে প্রাঞ্জল করে কাঞ্চন।'

'নিশ্চয়! পরকে মারলে তার আর কী উপকার করা হল? পরের জন্যে যে প্রাণ দেয় সেই তো মানুষ।'

'কোকর কোঁ—কোঁ।'

হর্ষবর্ধনের চিন্তাধারায় বাধা পড়ে হঠাৎ। পথের ধারে একজোড়া মুরগির সাড়া পাওয়া যায়।

হর্ষবর্ধন লাফিয়ে উঠে তিন পা পিছিয়ে আসেন। কাঞ্চন হাসতে থাকে ঃ 'মুরগিকে ভয় খাবার কিছু নেই। বলতে গেলে ওরাই আমাদের খাবার জানিস। ওরাই আমাদের ভয় খাবে।'

'তুমি জান না ভাই! কী সাংঘাতিক এই মুরগিগুলো। শুধু হাঁকডাক দিয়েই ছাড়ে না। ফাঁক পেলে...বুঝেছ? তাক করে একদিন দুটো মুরগি যা আমায় তাড়া করেছিল না!...এই পথেই...এইখানেই...'

'বলেন কি! এই মুরগি দুটো আপনাকে তাড়িয়ে ছিল...? কাঞ্চন অবাক ঃ ওদেরই তো আমরা তারিয়ে তারিয়ে খাই মশাই!'

'ওই দুটো কিনা তা আমি হলফ করে বলতে পারব না। এক মুরগির থেকে অন্য মুরগিকে আলাদা করে চেনা কোনও ভদ্রলোকের কম্মো নয়। ও কেবল পতিতুণ্ডীরাই পারে।'

'পতিতুণ্ডী? তারা আবার কারা?'

'যারা ওই সব পাজি মুরগিদের পুষেছে। এই পথের ধারেই তো ওদের পোলট্রি ফার্ম...হাজার হাজার হাঁস মুরগির আড়ত...ব্যাটারা কী বিচ্ছিরি চ্যাঁচায় যে রোজ সকালে!'

'ওই পতিতুণ্ডীরা চেঁচায় নাকি?' জানতে চায় কাঞ্চন।

'না, পতিতুণ্ডীরা নয়, মুরগিদের কথাই বলছি...' হর্ষবর্ধন কন ঃ 'আয়েস করে যে একটুখানি ঘুমোব সকাল বেলায়, হতভাগাদের চীৎকারে তার জো নেই। সমবেত কোকর-কোঁর যা ঐকতান...ভোরের মৌজটাই মাটি।'

'কই আজ তো ওরা তাড়া করলনা আপনাকে।'

'স্কয়বাউট দেখে ভয় খেয়েছে বোধহয়। তোমাকে দেখে, তোমার মিলিটারি পোশাক দেখে ভড়কে গেছে। সেদিন রাস্তায় আমায় একলাটি পেয়েই হয়তো...দেখ না, কেমন ভালো মানুষটি সেজে রয়েছে আজ! ভ্রূক্ষেপও করছে না আমাকে। দেখেও দেখতে পাচ্ছে না যেন...'

'হাজার হাজার মুরগি আছে পতিতুণ্ডীদের? বলেন কি?'

'তা, হাজার হাজার না হলেও শত শত তো বটেই! অন্তত বিশ-পঞ্চাশ জোড়া যে আছেই সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সোরগোল পাকায় রোজ সকালে!'

'তাহলে সেকালের বর্গীর হাঙ্গামার মতন মাঝে মাঝে মুরগির হাঙ্গামা বেধে যায় বোধহয় আপনাদের পাড়ায়?'

'হাঙ্গাম বলে! কখনও আমায় খোঁচায়নি বটে, খুঁচিয়ে দিলে কী হয় জানি না, কিন্তু না খোঁচাতেই, বলব কী ভাই, আমার বুকের এইখানটা খচখচ করে কেবল। ওই পতিতুণ্ডীরা ডজন ডজন মুরগির ডিম পায় রোজ, রোজ

রোজ কত ডিম খায় যে!...ডিমভাজা, ডিমের অমলেট, ডিমের কারি, ডিমের পোচ, ডিম সেদ্ধ, ডিমের কালিয়া—কত কী! আমার সহ্য হয় না আর!'

'তাতে হিংসে করার কী আছে? আপনি তো বাজার থেকে কিনে খেতে পারেন যত খুশি। পয়সার যখন আপনার অভাব নেইকো—'

'ওরা খায় তাজা ডিম, আর আমরা বাজার থেকে যা আনি তার আর্দ্ধেক পচা আর বাদবাকী আধপচা...ভাজতে গেলে তার গন্ধে ভূত পালায়। আর ওদের অমলেটের গন্ধ যখন নাকে লাগে, কী তার খোশবাই যে কী বলব। ...ওই পতিতুণ্ডী আর ওর মুরগিদের আমি দু-চোখে দেখতে পারি না।'

'ছিঃ! কাউকে কি হিংসে করতে আছে? পরকে ঈর্ষা করা কি উচিত আমাদের?' বলতে যায় কাঞ্চন।—'পরের হিতচিকীর্ষাতেই বেরিয়েছি যখন আমরা?'

হর্ষবর্ধন খেপে যান—'করব না হিংসে? আমার চেয়ে যার বেশি টাকা তার প্রতি আমার কোনও রাগ নেই, টাকা তো তুচ্ছ জিনিস, তার আবার দাম কী? কিন্তু এই পতিতুণ্ডীরা রোজই ডিমের মামলেট খায়। বিনা পয়সাতেই খায়, দু-বেলাই খেতে পায়। যখন খুশি খায়—যত খুশি খায়...ভাবতে গেলেই বুকটা জ্বলে যায় আমার...টাটকা টাটকা ডিম! ভাবতে গেলেই মন টাটাতে থাকে আমার!'

'দুঃখ করে কী করবেন! যার বরাতে যা। আপনার বরাতে অঢেল টাকা, ওদের ভাগ্যে ডিম! যার যেমন বরাত। কারও কারও বরাতে আবার ওদুটোর কোনওটাই নয়, ঘোড়ার ডিম খালি!...ওই একটা বাস আসছে, শহরতলির বাস বোধহয়।'

'কোথায় যাবে বাসটা?' তিনি শুধান।

'কোথায় যাবে কে জানে! ওটাকে থামাই? চেপে বসা যাক তো...তারপর দেখা যাক না কোথায় যায়!'

।। ছয় ।।

ঠাসাঠাসি ভিড় সেই বাসটায়। গাদাগাদি মানুষ। ভুরি ভুরি যাত্রীর সেই ভিড় নিজের ভুঁড়িভারে দমিয়ে হটিয়ে কোনও রকমে একটুখানি এগিয়ে যান হর্ষবর্ধন, কিন্তু আর এগোনো যায় না, চারধারে চাপে পড়ে এক জায়গায় চ্যাপটা হয়ে দাঁড়াতে হয়।

কাঞ্চন তার পলকা দেহ নিয়ে এগোয় না, দরজায় পাদানির ওপরেই ঝুলতে থাকে।

ইচ্ছায় বা অনিচ্ছাসত্বেই সে হয়তো কেটে পড়তে পারে এই ভেবে কণ্ডাকটার তার দিকেই হাত বাড়ায় সবার আগে—'টিকিট?'

'টিকিট দেব কেন?' কাঞ্চন গলা বাড়িয়ে বলে—'আমি কি তোমার বাস ছুঁয়েছি নাকি? পাশের ভদ্রলোকের পায়ের ওপরে আমি দাঁড়িয়ে, আর এই সামনের ভদ্রলোকের কোমর ধরে ঝুলে রয়েছি—তোমার বাসের এক ইঞ্চিও আমি স্পর্শ করিনি। টিকিট চাইছ কোন মুখে?'

পাশের ভদ্রলোক তার কথায় সায় দেন—'হক কথা। আমার পায়ের ওপরই দাঁড়িয়ে বটে ছেলেটা। বাচ্চা ছেলে বলে এতক্ষণ কিছু বলিনি কিন্তু কথাটা যখন উঠলই, তখন বলতে হয়। খোকা, এই অল্প বয়স থেকেই শিখতে হয়, এখনই তোমার জানা উচিত যে পরের ওপর কখনও নির্ভর করতে নেই। নিজের পায়ে দাঁড়ানো উচিত সবার।'

'তা তো জানি। দাঁড়াতেও রাজি, কিন্তু পাদানি পাচ্ছি কোথায়? আমার হাতের মুঠোয় কি পাদানি? সে তো নিজেই আপনি জুড়ে রেখেছেন—পা ছড়িয়ে। পা সরান না, ভালো করে একটু দাঁড়াব।'

'সরাব কোথায়?' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভদ্রলোক ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন।

'হলে আমি নাচার। সরি। সরি মানে যে সরছি তা নয়, এ সরি সে সরি নয়, এ হচ্ছে এস. ও. আর্...'

'আমার কোমর ধরে থাকাটাও তোমার ঠিক হচ্ছে না।' অপর ভদ্রলোক বলার সুযোগ পান তখন ঃ 'কোনও ছেলের কোমর-বনধ আমি পছন্দ করি না।'

'কোমর ছেড়ে কি কামড়ে ধরব তাহলে?' কাঞ্চন শুধোয়।

'কথার দরকার নেই আর। পয়সা ফেল বাপু। টিকিট কাটো।'

ভিড়ের গাদার মাথার ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে কণ্ডাকটারের তাগাদা।

'পয়সা পাব কোথায়? আমার কাছে একটিও পয়সা নেই। আমরা বয়স্কাউট, ট্রামে বাসে ট্রেনে আমাদের ভাড়া লাগে না। তবে তোমার এই বাসে যদি দিতেই হয় নেহাত, তবে ভেতরে আমার দাদা দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে হাত বাড়াও। তাঁর কাছ থেকে আদায় করে নাও ভাড়া।'

'কোথায় গো দাদা?' জনতার উদ্দেশে কণ্ডাকটারের হাঁক।

'কত তোমার ভাড়া হে?' ভিড়ের ভেতরে নিরুদ্দিষ্ট হর্ষবর্ধনের হাঁক শোনা যায়।

'পনেরো পনেরো—তিরিশ—দু-জনের।'

'কিন্তু আমার কাছেও পয়সা নেই যে।'

'খুচরো না থাকে, টাকাই দিন না—ভাঙিয়ে দিচ্ছি এখন।'

'টাকাও নেই। নোট রয়েছে খালি।'

'পাঁচ টাকার নোট তো? বাসে ভাঙানো দস্তুর না হলেও তাও ভাঙিয়ে দেব না হয়।'

'পাঁচ টাকার নোট নয়।'

'তবে কি দশ টাকার?'

'না। একশো টাকার নোট আছে কেবল।' হেঁড়ে গলায় ছেড়ে দেন হর্ষবর্ধন।

'তারও ভাঙানি পাবেন, তবে টার্মিনাস অব্দি যেতে হবে আপনাদের। হাজার টাকার নোট হলেও ভাঙিয়ে দেব, ফাঁকি দিয়ে পালাতে দেব না।'

'পালাতে পারলে তো! পালাবে কি করে?' ভিড়ের ভেতর থেকে বলে ওঠেন একজন—'চারধারেই তো জমাট।'

সেই জমাট ভিড়ের মধ্যেই যার-পর-নাই ঘাড় কাত করে চারধারে তাকান তিনি—কারও যে কোনও উপকার করবেন তার কোনও ফাঁক পান না তার ভেতর। হিতচিকীর্ষু হর্ষবর্ধন এ কোন ফাঁপরে এসে পড়লেন!

বিশ্বের হিতলালসায় লালায়িত হয়ে তিনি বেরিয়েছেন—কারও না কারও কিছু না কিছু উপকার তিনি করবেন—পারতপক্ষে রেহাই দেবেন না কাউকে। কিন্তু এর মধ্যে তাঁর সুযোগ কই?

নাম কেনার জন্য খবরের কাগজে জয়ঢাক পিটিয়ে কেউ কেউ পরের উপকার করে বটে, কিন্তু তিনি তাদের মতন নন। না, নিজেকে জাহির করার জন্য নয়। ভালো করার জন্যই তিনি পরের ভালো করবেন। তাক পেলেই করবেন, ফাঁক পেলেই করে দেবেন এবং করেই সরে পড়বেন—কেউ কিছু টের পাবার আগেই। নামের জন্য নয়। লাভের জন্যও না। নিঃস্বার্থভাবে পরের আর নিঃস্বের উপকার—খুব বেশি না হলেও, একটুও, একজনেরও অন্তত। একদিনে একটাই যথেষ্ট।

হ্যাঁ, একটাই বা কম কি? আজ একটা ভালো কাজ; কাল আরেকটা। পরশু হয়তো আরেক। তারপর দিন আবার একখানা। এবং এই ভাবেই বরাবর। এমনি করতে করতে ভালো কাজ করার অভ্যাস হয়ে যাবে। নেশার মতোন বদভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে শেষটায়।

এই করেই তো মানুষ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

এমনি তিল তিল সৎকাজ—এই তিলমাত্রাগুলিই জোট বেঁধে জমাট হয়ে তালমাত্রায় দাঁড়ায়—তখন তার তাল সামলাতে হিমশিম!

বিন্দু বিন্দু জলযোগে যেমন মহাসাগর গড়ে ওঠে। যখন তখন একটু একটু জলযোগ করার ফলে যেমন একদিন ডিসপেপসিয়া না হয়ে আর যায় না।

হ্যাঁ, ঠিক সেই রকম। নিজের তালেই ঘাড় নাড়েন হর্ষবর্ধন।

ইস্ কী ভিড় যে বাসটায়! মুরগি বোঝাই হয়ে চলেছে মানুষ। চারদিকেই ঠাসাঠাসি; নিশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে হর্ষবর্ধনের।

একে মোটা মানুষ, তার ওপরে ভিড়ের চাপ। হাত পা খেলিয়ে কিছু চাপল্য করার কোনও উপায় নেই কোনও দিকেই। ঘেমে নেয়ে তিনি অস্থির। কিন্তু কী করবেন, পরের উপকার করতে বেরিয়েছেন, নিজের আরামের কথা ভাবলে তখন চলে না। কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে, কটুক্তি সয়ে, এমন কি পরের পা মাড়িয়ে থেঁতো করে তিনি ভেতরে এসে সেঁধিয়েছেন—কারও আরামের কথা না ভেবেই।

অনেক ধাক্কাধাক্কি গালমন্দ হজম করে কোনওরকমে একটুখানি দাঁড়াবার ঠাঁই পেয়েছেন। সামনে লোক, পিছনে লোক, আশপাশে লোক—লোকে লোকে ছয়লাপ। মানুষের এই গাদার মধ্যে আলাদা করে নিজেকে বোঝা এবং বোঝানো দুঃসাধ্য। নিজেই নিজের কাছে একটা বোঝা হয়ে উঠেছেন!

তবুও তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে, কায়ক্লেশে তটস্থ থেকে, চারধারে তিনি তাকান। এদের মধ্যে কারও...কারও কি কোনও উপকার করা যায়? এখানে, এখনই, এই দণ্ডে এমন কোনও কাণ্ড করা যায় কি, যাতে নির্ঘাত কারও একটা ভালো হতে পারে।

প্রাণ তাঁর কণ্ঠাগত কিন্তু হলে কি হবে, পরোপকারের উৎকণ্ঠা তাঁর যায়নি।

ওত পেতে থাকলেই সুযোগ আসে। সঙ্গে সঙ্গেই একটু সুযোগ এসে জোটে। হোয়্যার দেয়ার ইজ উইল দেয়ার ইজ ওয়ে—বলে থাকে না? ইচ্ছেরা আর সুযোগরা কি করে পরস্পরের মালুম পায় বিধাতাই জানেন। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়, তারা ঠিক পিঠোপিঠি এসে পৌঁছচ্ছে।

কিন্তু হস্তক্ষেপের আগে তাঁকে ভাবতে হয়। তিনি থমকে যান—হাত না বাড়িয়েই। এটা কি ঠিক পরের উপকার করা হচ্ছে? অবশ্যি নিজেকে পর বিবেচনা করতে পারলে স্বতন্ত্র কথা—আর যদি নিজের উপকার করেই শুরু করা যায় তাতেই বা লজ্জা কিসের? চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম। এ-কথা কার অজানা? বাল্যকালের পাঠ্য বইয়ে পড়া—চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম—ভুলতে পারেননি তিনি এখনও। এই চারিটি কথা।

গোবরার উপকার করবার সুযোগে তিনি প্রবঞ্চিত হয়েছেন, এখন না হয় নিজের উপকার করে সেই ক্ষতিটা পুষিয়ে নেয়া যাক—মন্দ কি? নিজের উপকার দিয়েই শুরু করা যাক না—বিশ্ব তো পড়েই রয়েছে—পালাচ্ছে না—আর সময়ও অঢেল—কাউকেই তিনি বঞ্চিত করবেন না। রেহাই দেবেন না কাউকে। আত্মপর নির্বিচারে উপকার করে যাবেন সবার।

সঙ্কোচ কাটিয়ে হর্ষবর্ধন পকেটে হস্তক্ষেপ করেন।

নিজের পকেটে। অনেকক্ষণ থেকেই তাঁর ঠাওর হচ্ছিল পাশের লোকটি যেন তাঁর পকেট হাতড়াচ্ছে। হয়তো সেই হাজার টাকার নোটের খবর পাবার পর থেকেই। ভিড়ের ঠেলায় গাদাগাদির গুঁতোয় ভালো করে কিছু দেখাও যায় না ছাই—কিন্তু তাহলেও ওরই ভেতরে নিজেকে বাঁচানোও তো দরকার। নিজে না বাঁচলে পরকে তিনি বাঁচাবেন কি করে? ওরই মধ্যে, ভিড়ের ফাঁক-ফোকরের ভেতর দিয়েই কোনও গতিকে তিনি হাত চালিয়ে দেন—নিজের পকেটের দিকে। খুব কৌশলেই তাঁকে চালাতে হয়।

যা অনুমান করেছিলেন তাই। আরেক জনের হাত তার আগেই সেখানে সন্নিবিষ্ট রয়েছে। তাঁরটিও সেখানে অনুপ্রবিষ্ট হয়।

অবশ্যি, একশো টাকার একখানা নোট গেলে তাঁর কিছুমাত্র যায় আসে না। ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না কোনও। অমন অনেক একশো টাকার নোট নিয়েই তিনি বেরিয়েছেন—পরকে দেবার জন্য উদ্যত হয়েই। ওকেও একটা দেবেন না হয়, কিন্তু এইভাবে নিতে দেবেন কেন? পরের অপকার করে নিজের উপকার করার এই আডিয়াটিই খারাপ। এর তিনি প্রশ্রয় দেবেন না কদাচ। লোকটাকে তিনি হাতে-নাতে পাকড়াবেন, তারপর একশো টাকার নোটখানা তার হাতে তুলে দিয়ে সুশিক্ষাও দেবেন হাতে হাতে।

এদিকে এক নিঃশব্দ লড়াই—যাকে প্রায় হাতাহাতিই বলা যায়। একমাত্র পকেটের ফাঁকে দু-দুটো—বিশেষ করে হর্ষবর্ধনের তো হাত নয়—শ্রীহস্ত! এক হাত হৃষ্টপুষ্টতা তাঁর।

অপর হাতখানি বেরিয়ে পড়তে ব্যতিব্যস্ত হয়, কিন্তু পেরে ওঠে না। হর্ষবর্ধনের হাত তাকে গ্রাস করে রয়েছে—এক হাত নিয়ে রেখেছে বেচারাকে।

হর্ষবর্ধন চেঁচিয়ে উঠতে চান—কিন্তু বিস্ময়ে তাঁর বাক্যস্ফূর্তি স্তব্ধ! অপর ব্যক্তি বিলকুল চুপ—সে যে কে, টের পাবারও জো নেই। ভিড়ের মধ্যে ভিড়ে গিয়ে বেমালুম হয়ে গেছে...সামনের পেছনের কি আশপাশের কোন ধারের যে প্যাসেঞ্জার তিনি—আন্দাজ পাবার উপায় নেই। হর্ষবর্ধন নিজেই চিঁড়ে চ্যাপটা হয়ে রয়েছেন—হারিয়ে গেছেন যেন নিজেই—নিজেকে যেকালে খুঁজে পাচ্ছেন না, সামলাতে পারছেন না, এই টালমাটালের মধ্যে এই জনতা—এখন একটু দুর্জনতাই বলা যায়—এই জমাটি ভেদ করে বাঞ্ছিত জনকে আবিষ্কার করবেন কি করে?

'দেখুন আপনারা ভালো করছেন না।' মাঝখান থেকে আরেকজন বলে ওঠেন 'ভালো করছেন না কিন্তু।'

'আপনাদের দুজনকেই আমি বলছি।' কোনওরকমে ঘাড় কাত করে লোকটি হর্ষবর্ধনের মুলাকাত করেন ঃ 'আপনাকেই আমি বিশেষ করে বলতে চাই।'

'অ্যাঁ'? হর্ষবর্ধন চমকে উঠে হকচকান।

'হ্যাঁ। আপনাকেই...আপনারা দুজনেই আমার জামার পকেটে একসঙ্গে হাত পুরেছেন।' কাতর কণ্ঠে উল্লেখ করেন ভদ্রলোক ঃ 'কিন্তু আমি বলতে চাই—এটা কি আপনাদের ভালো হচ্ছে?'

'অ্যাঁ? তাই নাকি?' শশব্যস্ত হয়ে হর্ষবর্ধন তাঁর শ্রীহস্ত টেনে নেন। অপর হাতটিও অবিলম্বে অন্তর্হিত হয়!

'নিজের ট্যাকের খবর কে আর বেফাঁস করে? এতক্ষণ চুপ করে ছিলাম তাই। বলিনি কিছু এতক্ষণ। কিন্তু আর চুপচাপ থাকা যায় না। পাছে এই গরিবের পকেটটা ফেঁসে যায় তাই বাধ্য হয়েই না বলে আর পারলাম না। মশাইরা! অনর্থক আমার জামার মধ্যে আপনারা মারামারি করে মরছেন! নিছক হয়রানি। পকেটে আমার একটা পাই-পয়সাও নাই। এমন কি, একটা নস্যির ডিবেও না!'

'আমি তো...আমি তো...' বিব্রত হয়ে হর্ষবর্ধন আমতা-আমতা করেন।

অপর ব্যক্তির কোনও উচ্চবাচ্য নেই। বাস থেকে তিনি বেবাক উপে গেছেন যেন। বিলকুল উপেন্দ্রনাথ!

'একশো টাকার নোটওয়ালা সেই হেঁড়ে গলাটা না? একশো টাকার নোট দেখিয়ে ফাঁকি দিয়ে বিনা টিকিটে বাসে যাওয়া হচ্ছে সঙ্গে আবার বাচ্চা একটা সাকরেদ নিয়ে—ভাড়া মারার ওপর আবার পকেট মারা! আস্ত গাঁটমার একটা।' ওধার থেকে চোটপাট আরেক জনের—'পাকড়ান লোকটাকে।'

'আমি নিজের পকেট ভেবেই...' হর্ষবর্ধন বলতে যান।

'নিজের পকেট ভেবে পরের পকেটের মুণ্ডপাত করছিলেন!' পকেটবান ভদ্রলোক বলেন তখন—'কিন্তু আপনিই বলতে গেলে বেশি হানি করেছেন মশাই! উনি হাত পুরেছেন পুরেছেন, ওর সরুহাত, কিছু না পেলে আপনিই গুটিয়ে নিতেন, সরে পড়তেন চুপচাপ। কিন্তু মশাই আপনি আবার ওপর চড়াও করে তার ওপরে হানা দিয়ে কী কাণ্ডখানা করেছেন দেখুন! আমার পকেটের সর্বনাশ করেছেন। একেবারে সব ফাঁসিয়ে দিয়েছেন দেখুন।'

ভদ্রলোক নিজের জামাটা দেখাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু কোনও দিকেই ফাঁক না পেয়ে তাকমাফিক দেখাতে পারেন না।

—'হাত দিয়েই দেখুন না কেন। হাত গলে যাবে আপনার। লজ্জা কিসের?'

কিন্তু লজ্জা পান হর্ষবর্ধন। যেখান থেকে হাত সরিয়ে এনেছেন, সেখানে আবার হস্তক্ষেপ করতে তাঁর সঙ্কোচ হয়। নিজের কীর্তির পরিচয় নিজে লাভ করতে তিনি অনিচ্ছুক।

কিন্তু দেখতে না পেলেও হর্ষবর্ধন অনুভব করতে পারেন। বিমর্ষ হয়ে থাকেন।

'কোনও ক্ষতি নেই। কিছু ভাববেন না—বাসেই এখুনি আমি আপনার ক্ষতিপূরণ করে দেব।' সঙ্কোচ কাটিয়ে কোনও রকমে তিনি প্রকাশ করেন—'কিন্তু নিজের পকেটেই যে হাত পুরতে পারছিনে।—কী মুশকিল!'

'ও-সব হাত সাফাইয়ের কথায় ভুলছিনে আমরা। আচ্ছা করে ধোলাই দেওয়া হবে তোমায়। বাসটা থামুক না। নামুক না সবাই—দেখে নেব তোমাকে।'

গর্জে ওঠে বাসসুদ্ধু লোক।

খেপে যায় সবাই, পকেটমারকে হাতে পেয়েও নাগালে পাচ্ছে না। খাবার গালে পেয়েও চিবুতে না পারার দশা! হাত নিশপিশ করতে থাকে সবার।

সকলেই মারতে মরীয়া। কিন্তু মারে কী করে? মাথার ওপরের লোহার রড়ের হাতল হাত-ছাড়া করে তবেই মারামারি করতে হয়। অথচ হাত ছাড়লেই হুমড়ি পড়তে হবে। কিন্তু পড়বেই বা কেথায়? ঠাস বোঝাই বাস—পড়বার তিলমাত্র স্থান নেই। কিংবা তিলমাত্র স্থানই রয়েছে কেবল। তিল ছাড়া আর কিছুই সেখানে পড়তে পায় না, কোনও তালেই নয়।

অগত্যা সবাই অসহায় ক্রোধে মারমুখো হয়ে চিঁড়ে-চ্যাপটা অবস্থায় দুলতে দুলতে রাগে ফুলতে ফুলতে যায়—বাগে পায় না!

হর্ষবর্ধন ভারী কাহিল হয়ে পড়েন। পালাবেন ভাবেন, কিন্তু সরবেন কোন ফাঁকে? ছুঁচ গলানোর ফাঁক নেই, কিংবা সেইটুকুই ফাঁক রয়েছে বোধহয়। কিন্তু এই দেহ নিয়ে তো আর সূচীভেদ্য হওয়া যায় না। ভয়ে তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসে। চোখে অন্ধকার দেখেন।

ডালহৌসি স্কোয়ারে বাস পৌঁছয়। সবাই নামে। হর্ষবর্ধনকেও নামতে হয়। দুরু দুরু বুকে কাঁপতে কাঁপতে তিনি নামেন।

মার খাবার আশাতেই তাঁকে নামতে হয়। কিন্তু না, তিনি নামবার আগেই দক্ষযজ্ঞ বেধে গেছে।

'মার ব্যাটা পকেট-মারকে।'

'দে পিটন কষে।'

বলে যে যাকে পাচ্ছে চোর সাব্যস্ত করে ধরে বেঁধে কিল-চড়-ঘুসি বসিয়ে হাতের সুখ করে নিচ্ছে ফাঁকতালে।

হর্ষবর্ধনের গায়ে আঁচড়টিও লাগে না।

মারামারির মধ্যে একজন হাত গুটিয়ে নেন হঠাৎ। গলা বাড়িয়ে বলেন—'আজকের মতন থাক। আপিসের টাইম হয়ে গেল।'

লালদীঘির বড় ডাকঘরের ঘড়িতে দশটা বাজো বাজো।

আপিস যাত্রীরা সবাই মারামারি ছেড়ে তখন দৌড়োদৌড়ি লাগায়। ব্যস্তসমস্ত হয়ে যে-যার আপিসের পানে চলে যায়।

হর্ষবর্ধন তখন যেন চোখে দেখতে পান...

দেখতে পান কাঞ্চনকে।

সামনেই দাঁড়িয়ে।

'কোথায় ছিলে হে এতক্ষণ?'

'এখানেই ছিলাম তো। দেখছিলাম, কেউ আপনার গায়ে হাত দেয় কি না!'

'তাহলে বাঁচাবার চেষ্টা করতে বুঝি?'

'করতাম বইকি। রক্ষা করার চেষ্টা করতাম। না পারলে পরে আপনাকে তখন হাসপাতালে নিয়ে যেতে হত আমায়। তৈরি হয়েছিলাম তাই।'

'তাতো ছিলে। কিন্তু কী মজা দেখ। আমি ওদের উপকার করতে চেয়েছিলাম, অন্তত যার পকেট ফাঁসিয়েছি তার তো বটেই। কিন্তু ওরাই উল্টে আমার উপকার করে গেল। নিজেরাই মারধোর খেয়ে খুশি হয়ে চলে গেল সবাই। আমার গায়ে আঁচড়টিও না কেটে।'

'আশ্চর্য আচরণ! আমিও ভাবছি অবাক হয়ে এই কথাই।' বলল কাঞ্চন।

এমন সময়ে এগিয়ে এল একটি লোক...

।। সাত ।।

লোকটিকে এগিয়ে আসতে দেখে হর্ষবর্ধন কাঞ্চনে কানের গোড়ায় ফিসফিস করলেন—'লোকটাকে কেমন চিনি চিনি মনে হচ্ছে হে!'

'চিনি চিনি ঠেকছে বলেই মধুর সম্পর্ক স্থাপন করতে যাবেন না যেন।' কাঞ্চন ওঁকে সাবধান করে, 'কলকাতায় লোক চেনা ভারী শক্ত, বাবা বলেন। চেনারা তো বটেই, অচেনা লোকরাও প্রায়ই সর্বনেশে হয়।' সে বেশ করে তাকিয়ে দেখে তার দিকে...'কই, আমার তো তেমন মিঠে বলে বোধ হচ্ছে না।'

লোকটি এগিয়ে এসে হাত তুলে হর্ষবর্ধনকে নমস্কার জানায়।

'আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি মনে হচ্ছে.।' প্রতি নমস্কার করে বললেন হর্ষবর্ধন।

'কোথায় আর দেখবেন—বললে সে 'ওই বাসেই দেখেছেন। আপনার পাশেই দেখেছেন।'

'বাসেই দেখেছি, আমার পাশেই দেখেছি? বলেন কি?' অবাক হন হর্ষবর্ধন, 'কই, মনে করতে পারছিনে তো!'

'সে কি! একটু আগে আপনার সঙ্গে হাতাহাতি হয়ে গেল না?'

'না। আমার সঙ্গে নয়—আমার সঙ্গে কারও হাতাহাতি হয়নি। ওরাই গায়ে পড়ে মারামারি করে পরস্পরকে মেরে ধরে চলে গেল যে যেখানে। আমাকে কেউ কিছু বলল না, বলতে কি, গ্রাহ্যই করল না আমায়।'

'আহা, আপনার সঙ্গে আমার হাতাহাতি হল না—ওই বাসের মধ্যে? একজনের পকেটের ভেতর? এর মধ্যেই ভুলে যাচ্ছেন?'

'তাই নাকি? ও, বুঝেছি। আপনিই বুঝি সেই পকেট—' তারপরের মারাত্মক কথাটা উচ্চারণ করতে তাঁর ভদ্রতায় বাধে। সঙ্কোচ জাগে স্বভাবতই!

'সেই পকেটমার। ধরেছেন ঠিক।' অসঙ্কোচে সেই লোকটিই প্রকাশ করে।—'আমি ভেবেছিলাম ওটা আপনার পকেট। আপনার পকেটে একশো টাকার নোট আছে শুনলাম না? আপনিই তো জানিয়ে দিলেন। আর, তারপরই বেজায় লোভ হল আমার। আমি আর আত্মসম্বরণ করতে পারলাম না!'

'তাতে কী হয়েছে তাতে কী হয়েছে! আপনি নিন না একখানা নোট। অনেক আছে আমার। আমি তখনই ওই বাসের মধ্যেই এঁচে রেখেছিলাম যে নোটখানা আপনাকে দেব। কিন্তু কখন যে আপনি সুরুত করে নেমে পড়লেন তা ধরতেই পারলাম না।'

'পাছে কেউ ধরতে পারে সেই ভয়ে শুরুতেই নেমে পড়েছি সুরুত করে। একটু সুবিধে হয়ে গেল ওই সর্ষেটার জন্য। নইলে ধরা পড়ে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে চোখে সর্ষে দেখতে হত আমায়! এক রকমের শাপে বর হয়ে যাওয়া আর কি! আর তার জন্যেই ওই ভিড়ের ভেতর দিয়ে পিছলে বেরিয়ে আসতে পেরেছি কোনও গতিকে।'

'পিছলে বেরিয়ে এলেন কি রকম?' কাঞ্চন অবাক হয়ে শুধোয়।

'আমার দিকে তাকিয়ে দেখ না ভাই! তাহলেই তুমি ঠাওর পাবে।'

কাঞ্চন তাকিয়ে দেখে, হর্ষবর্ধনও তাকান।

'জামা কাপড়ে আপনার বেজায় তেল জবজব করছে যে!'

'ভারী তেল হয়েছে দেখছি আপনার।' কাঞ্চনও তাঁর কথায় সায় দেয়।

'দুঃখের কথা বলব কি, আবার সুখের কথাই বলতে হয়। পোয়াটাক সর্ষে নিয়ে যাচ্ছিলাম বাড়ির জন্য—ফরমাশ দিয়েছিল বউ।

ইলিশসর্ষে না কী যেন বানাবে। বাজারের থাল নিয়ে বেরুতে ভুলে গেছি, তাই সর্ষের খানিকটা বুক পকেটে আর বাকিটা পাশের দু-পকেটে রেখেছিলাম কিন্তু বাসের ওই ভিড়ের চাপে—যাঁতাকলের বেহদ্দ চাপ—সর্ষেগুলো পিষ্ট হয়ে তেল বেরিয়ে গেছে। আর মন্দের ভালো, সেই তেলের দরুণই সবার অলক্ষে পিছলে বেরিয়ে আসতে পেরেছি।'

'বাঃ বাঃ!! বাহবা দেন হর্ষবর্ধন। তেল দিয়ে কী না হয় জানা ছিল তাঁর। এখন ওই তেল দিয়ে আরও কত কী হয় দেখলেন স্বচক্ষে।

'এখন বাড়ি যাব কোন মুখ নিয়ে ভাবছি তাই। বউ কি আজ আর রক্ষে রাখবে আমার? অত করে সর্ষে নিয়ে যেতে বলেছিল। অথচ তিনটে পকেটের কোনওটাতেই এক চিলতে সর্ষে নেই...'

'সর্ষে দেখতে পাচ্ছেন না তাই চোখে সর্ষে দেখছেন?' ফোড়ন কাটে কাঞ্চন।—'তার কী হয়েছে? তেল তো মেখেছেনই, সামনেই লালদীঘি। চান টান সেরে বাড়ি চলে যান সটান।'

'আর এই ধরুন...' হর্ষবর্ধন নোটখানা এগিয়ে দেন—'নিন এটা। নেয়ে টেয়ে নতুন জামা কাপড় কিনে নিন, তারপরে পোশাক বদলে ট্যাক্সি করে বাড়ি যান—বাসে চাপবেন না যেন আর।'

টাকাটা হাতে পেয়ে লোকটি আর দাঁড়ায় না। লালদীঘিতে ডুব দিতে না গিয়ে এক ডুবে ডালহৌসির জনসমুদ্র পার হয়ে যায়।

হর্ষবর্ধন আপসোস করেন—'ওই ভদ্রলোককে যদি দেখতে পেতাম যাঁর পকেট আমাদের হাতাহাতিতে ফেঁসে গেছে...তাঁকেও ক্ষতিপূরণস্বরূপ কিছু দেবার ইচ্ছা ছিল আমার...কখন নেমে কোন দিক দিয়ে কোথায় যে উধাও হয়ে গেলেন টেরই পেলুম না।'

'তিনিই তো আসল দায়ি, না নিজের জামায় পকেট রাখেন, না-এই সব পকেটমারির হাতাহাতি হয়। সেটা বুঝেই লজ্জায় পড়ে হয়তো তিনি সবার চোখ এড়িয়ে সরেছেন। কিংবা মার খাবার ভয়েও হতে পারে হয়তো।'

'সেই যে দায়ি তোমার এ-কথা আমি মানি। জজেও মানবে।' হর্ষবর্ধন জানান ঃ 'যে লোকটা জামার পকেট রাখে অথচ পকেটে কারও জন্যে কিছু রাখে না তার মতন নেমকহারাম আর হয় না। কিন্তু তাহলেও, তার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে। আহা, কিছু দিতে পারলাম না লোকটাকে। ধরতেই পারলাম না একেবারে।'

'ধরবেন কি করে? মানুষকে কি ধরা যায় নাকি? মানুষকে ঠিক ঠিক ধরতে পারা শক্ত ব্যাপার। সে এক মহামারী কাণ্ড—বাবা বলেন। আসলে মানুষ হচ্ছে বিধাতারই রূপান্তর তো—নামান্তরও বলা যায়। এই কারণেই, ভগবানের ন্যায় মানুষও নিজগুণে কিংবা নিজরূপে—যাই বলুন—ধরা না দিলে ধরতে পারে কার বাবার সাধ্যি।'

'ধরা নাই দিল, বয়েই গেল আমার। একজনকে দিয়েছি, দিতে পেরেছি সে যথেষ্ট। তার আনন্দই রাখবার জায়গা নেই। টাকায় হালকা হতে পেরে এমন ফূর্তি হচ্ছে আমার—বলব কী! নাচতে ইচ্ছে করছে—নাচব?'

'নাচতে জানেন আপনি?'

'ঠিক জানিনে। তবে লাফাতে জানি। তাহলে লাফাই?'

'ওই দেহ নিয়ে—দেহ না বলে কলেবর বললেই ঠিক হয়—যদি আপনি লাফান তো সেটা আপনার বাংলা মতেও লাফানো হবে আবার ইংরেজি মতেও...'

'ইংরেজি মতেও লাফানো হবে? তার মানে?'

'তার মানে এল-এ-ইউ-জি-এইচ্...তার মানে, তেমনি লোক হাসানো একটা ব্যাপার হবে আপনার।'

' দেখ, তোমার ওই গ্যাড ম্যাড বুলি গোবরার কাছে চালিয়ো আমার কাছে নয়। আমার কাছে তোমার ওই ইংরিজি বিদ্যে ফলাতে এস না। আমিও জানি ইংরিজি। উল্টোপাল্টা বললেই হল। এ-বি-সি-ডি দিয়ে কি শুরু নয় ইংরিজির? আমি কি জানিনে নাকি? আমার কাছে ফাঁকি মারা হচ্ছে? এ-বি-সি-ডি-ই-এফ-ই-এফ- জি-এচ...জি-এচ-আই-জে-কে...আই-জে-কে...এম এম... এল এম.....ওয়ান মর্ণ আই মেট এ লেম ম্যান.....আমারও এলেম আছে ভায়া?'

'যেতে দিন যেতে দিন।' কাঞ্চন কথাটাকে ঘুরিয়ে দিতে যায়—'পরের উপকার করতে যাওয়া কী ঝকমারি দেখলেন তো? আপনি পরের উপকারের মতলবে বাসে উঠলেন, করে বসলেন নিজের উপকার...'

'নিজের উপকারটা কী করলাম?'

'পকেটমারের হাত থেকে নিজের পকেট বাঁচাতে গেলেন—নিজের উপকার নয়? কিন্তু করতে পারলেন কি? তাই করতে গিয়ে অপরের পকেট ফাঁসিয়ে দিলেন। তারপর দেখুন, লোকগুলো আপনার প্রতি মারমুখো হয়ে, আপনাকে মারবে বলে কোমর বেঁধে এল—মারার চেয়ে পরের অপকার আর কী হতে পারে? শেষে কিনা আপনার গায়ে আঙুলটি না ছুঁইয়ে নিজেরাই মার-ধোর খেয়ে খুশি হয়ে চলে গেল।'

'তবেই বোঝ।'

'বুঝে তো থই পাচ্ছি না—থ হয়ে গেছি। পরের উপকার করতে গেলে অপকার হচ্ছে আর অপকার করতে গিয়ে উপকার হয়ে যাচ্ছে, এ-রকম উল্টো উৎপত্তি হচ্ছে কেন?' কাঞ্চন জিজ্ঞাসু।

'উপকার করা অত সহজ নয় হে।' বোঝান তাকে হর্ষবর্ধন ঃ 'বুঝেসুঝে করতে হয়। পরের উপকার তো বটেই, এমন কি নিজের উপকার করতে হলেও যথেষ্ট সাবধানতার দরকার। সতর্ক হয়ে করা উচিত। হট করে করে ফেললেই হল না। উপকারের হঠকারিতা অপকারের চেয়েও ঘোরতর হতে পারে।'

'পারেই তো।' কাঞ্চন সায় দিয়ে বলে—'একটা বাস আসছে। উঠবেন?'

'বাস? আর বাস এ জীবনে নয়। তার চেয়ে ওই যে ফাঁকা ট্রামটা যাচ্ছে তাতেই ওঠা যাক বরং।' কিন্তু কেমন যেন ওঁর খটকা লাগে,—'এ সময়ে ট্রামটা এমন ফাঁকা কেন হে? এই আপিস টাইমের মাথায়?'

'আপিসের লোকদের ডালহৌসি স্কোয়ারে উজাড় করে দিয়ে এখন আপ-এ ফিরে যাচ্ছে কিনা, তাই।'

'কোথায় যাবে ট্রামটা?'

'বেহালায়।'

'কেমন জায়গাটা?'

'কে জানে! যাইনি কখনও।' জানায় কাঞ্চন ঃ 'তবে বেহালা যখন। তখন বাজে নিশ্চয়ই!'

'চলো। বাজে জায়গাতেই যাই না হয়। বেহালাই বাজাই গিয়ে।' হর্ষবর্ধন উঠে পড়েন কাঞ্চনকে নিয়ে।

এসপ্ল্যানেড পৌঁছতেই ট্রামটা প্যাসেঞ্জারে ভরপুর হয়ে ওঠে। হর্ষবর্ধনও ভাবনায় ভর্তি। কত কী ভাবনা। পরের উপকার করা কী দুঃসাধ্য ব্যাপার তিনি ভাবেন। কখন, কোথায়, কীরূপ উপকার করবেন? কি করে—কেমন করেই বা করবেন? ফাঁক কই করবার?

হঠাৎ তিনি চোখ তুলে দেখেন, ওধারের সামনের সিটে একটি মাঝবয়সী মহিলা এসে বসেছে কখন। রোগা, লম্বাটে মুখ, বেশভূষায় পরিচ্ছন্ন হলেও সর্বাঙ্গে দারিদ্রের ছাপটা পরিষ্কার। হর্ষবর্ধন তাক করে দেখেন।

কাঞ্চনকে তিনি বলেন—'তাকিয়ে দেখ। দেখছ মেয়েটিকে?'

'হ্যাঁ।'

'কেমন যেন বিষণ্ণ বিষণ্ণ? তাই না?'

'মলিন চেহারা, ম্রিয়মাণ অতিশয়!'

'জীবনসংগ্রামে ও যে বিপর্যস্ত, তা বেশ বোঝা যায়। বিপর্যস্ত, পর্যুদস্ত—যৎপরোনাস্তি আর যা যা বলা যায়।'

'নাজেহাল। লেজে গোবরে। ধ্বংসাবশেষ।' কাঞ্চন শেষ করে।

'ওর পাশে আমি বসছি গিয়ে, বুঝলে? তারপর তাক বুঝে—ওর পাশেই ওর হাতব্যাগটা, পড়ে রয়েছে দেখছ তো!—তার ফাঁক দিয়ে একখানা একশো টাকার নোট গলিয়ে দিই, কেমন?'

শুনেই কাঞ্চন আঁতকে ওঠে—'খবরদার!'

'কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরে দীর্ঘপথ? উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ? পড়নি পড়ার বইয়ে? ভয় পেয়ে ঘাবড়ে গিয়ে পিছিয়ে এলে চলবে না। মন্ত্রের সাধন নয় শরীর পাতন। নিজের কর্তব্য করতেই হবে। যা করতে বেরিয়েছি আমরা...'

বলেই তিনি সটান উঠে গিয়ে বসেন মহিলার পাশটিতে। আর ভাবতে থাকেন করতে পারলে কাজটা কী চমৎকারই না হবে। যদিও তাঁর বুক দুর দুর করে, তবু মনের ভেতর যেন অজানা রাগিনীর সুর ভাঁজতে থাকে। মেয়েটি যখন বাড়ি ফিরে তার ব্যাগের মুখ খুলে নোটখানা দেখতে পাবে তখন কী অবাকই না হবে সে! অচেনা উপকারীর কথা ভেবে ভগবানের মহিমায় কী গদগদই না হয়ে উঠবে। আহ্লাদে আটখানা হয়ে যাবে। ভেবে তিনি আপন মনেই পুলকিত হতে থাকেন।

একশো টাকার নোটখানাকে মুঠোর মধ্যে ভাঁজ করে পাশেই পড়ে থাকা ব্যাগের মুখ ফাঁক করে গুঁজে দেবার তাক খোঁজেন...

উপকার করার দুঃসাহসে তাঁর হাত কাঁপতে থাকে। বুক গুড় গুড় করে...

তাক বুঝে ফাঁক গলিয়ে ফেলতে যাবেন...

এমন সময় মাঝখান থেকে এক বাজখাঁই আওয়াজে চারধার চৌচির করে দেয়...

'মারল মারল পকেট মারল।'

সবাই যেন একসঙ্গে চমকে গিয়ে চলকে ওঠে। অজ্ঞাতসারেই নিজের নিজের পকেটে হাত যায় সবার।

'পকেট নয়, ব্যাগ।' চিৎকারী লোকটি নিজের ভ্রম সংশোধনে ব্যগ্র হয়—'ওই যে, ভদ্রমহিলাটির হাতব্যাগ, হাতসাফাই করছিল ওই লোকটা। আমি স্বচক্ষে দেখলাম।'

সঙ্গে সঙ্গে হর্ষবর্ধন নিজের হাত সরিয়ে নেন। সসঙ্কোচে চটপট নিজের পকেটে পুরে দেন তৎক্ষণাৎ।

'দেখুন তো! লোকটা আপনার ব্যাগ থেকে কিছু সরাতে পেরেছে কি না।' কানফাটানো গলাটা খনখন করে ওঠে আবার।

কেবল গলাই নয়, কোণের সীটের উত্তেজিত লোকটা নিজের হাতও বাড়ায়—আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় লোকটাকে।

হর্ষবর্ধন কেমন যেন গুটিয়ে যান নিজের মধ্যে—আপনার থেকেই।

এক্ষেত্রে তার কী করা উচিত কাঞ্চন কিছু ভেবে পায় না। চুপটি করে তাকিয়ে থাকে কেবল।

'আমার হাতব্যাগে কিছুই নেই তো নেবে কী?' শান্তকণ্ঠে বলেন ভদ্রমহিলা।

'তবু একবার দেখুন না, ক্ষতি কিসের?' অনুরোধ করে সবাই।

'তিনটি মাত্র সিকি ছিল।' ব্যাগটার মুখ ফাঁক করে তিনি তাকিয়ে দেখেন খানিক—'ঠিকই আছে।...ওমা, একী!' বলেই তিনি আঁতকে ওঠেন তক্ষুনি।

'কী হল! কী হল?' সবাই সচকিত হয়ে উঠল—'সরিয়েছে তাহলে মোটামুটি?'

'নাকি, একটা সিকি কম পড়েছে বোধহয়? ওই লোকটাই সরিয়েছে নির্ঘাত।'

'সিকি কথা? দেখছি আমরা ওর পকেট হাতড়ে। বার করছি সিকিটা।'

'সিকি বলে কথা! এ বাজারে একশো হাত মাটি খুঁড়লে—কি হাজার বার মাথা খুঁড়লে একটা পয়সা মেলে না। আর, আস্ত একটা সিকি—বলেন কি!'

'না। সিকি নয়! এই একশো টাকার নোটখানা এল কোথ থেকে?' মহিলাটা কন, 'এটা তো এখানে ছিল না আগে আমার ব্যাগে।'

।। আট ।।

সারা কামরায় সোরগোল পড়ে যায়। থেমে যায় ট্রাম। সবাই হইচই করে। পাশের সবলকায় লোকটি বজ্রমুষ্টিতে হর্ষবর্ধনের হাত চেপে ধরে, তারপরে শান্ত স্বরে বলে—'দেখুন তো, আপনার ব্যাগ থেকে কিছু সরাতে পেরেছে কি না!'

'না, কিছু নিতে পারেনি।' ব্যাগের ভেতরে দৃষ্টিপাত করে মেয়েটি জানায়—'বেচারার পোড়া বরাত! নেবে কি? ছিল তো মোটে তিনটে সিকি আর চারটে পয়সা—তাই রয়েছে। নিতে পারেনি কিচ্ছু!'

'আপনি কি ওকে পুলিশে দিতে চান?' জানতে চায় কন্ডাকটার।

'চুরি করতে পারেনি তো পুলিশে দিয়ে কী হবে?' মেয়েটি শুধোয়।

'চুরি....চুরি...চুরি...আমি...আমি তো...' হর্ষবর্ধন অস্ফুট স্বরে আমতা আমতা করেন।

'ধিক ধিক! মেয়েছেলেদের পকেট মারতে গেছ? গলায় দড়ি দাওগে—' ধিক্কারধ্বনি ওঠে চারধার থেকে ঃ 'কেন আমাদের কি পকেট ছিল না? না, পকেটে কিছু ছিল না আমাদের? দাও ওকে ট্রাম থেকে ফেলে। দূর করে দাও। ছুড়ে দাও রাস্তায়। ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ভাগাও, পুলিশ ডাকো। পুলিশ পুলিশ।'

নানান কণ্ঠের নানারূপ নালিশ শোনা যায়।

কন্ডাকটারও যেন খাপ্পা হয়ে ওঠে এই বেখাপ্পা লোকটির ওপর।—'এই, উঠে এস। নেমে যাও গাড়ির থেকে!'

তাড়া লাগায় সে।—'নিকালো হিঁয়াসে।'

এমন সময় মেয়েটির আর্তনাদ ধ্বনিত হয়—'একী, এটা কী? এটা এল কোথ থেকে?'

ততক্ষণে তিনি ব্যাগের এক কোণে গুটিসুটি পাকানো পড়ে থাকা কাগজখানার ভাঁজ খুলে ফেলেছেন—'এ টাকা তো এখানে ছিল না?'

'একশো টাকার নোট দেখছি।' হর্ষবর্ধনের পাশের লোকটি প্রকাশ করেন—'এখন বুঝতে পারা যাচ্ছে। আপনার এই নোটের খবর পেয়েই লোকটা আপনার পিছু নিয়েছে। এই টাকাটা মারবার জন্যেই।'

'কিন্তু এই টাকা তো ছিল না আমার।' মেয়েটি জানায়।

'ছিল না তো এল কোথ থেকে?' পার্শ্ববর্তী তাঁর কথায় সায় দিতে পারেন না—'আপনার পার্সের মধ্যেই ছিল। খেয়াল ছিল না আপনার। কখন ভুলে রেখেছেন মনে করতে পারছেন না।'

'একশো টাকার নোট আমি চোখেই দেখিনি কখনও।' মেয়েটি বলে, 'সে সৌভাগ্য হয়নি এখনও আমার। প্রাইমারি স্কুলের মাস্টারনীর চাকরি করি, দেড়শো টাকা মাইনে পাই, সে ওই খাতা কলমেই। হাতে পাই মোট সাতাশি টাকা মাত্র। একশো টাকার নোট আসবে কোথ থেকে?'

'আপনার থেকে কি আসে? টাকা সে চিজই নয়।' বললেন একজন—'আপনার টাকাই। অনেক আগের থেকে রাখা ছিল, খেয়াল করেননি। দেখতে পেলেন এখন।'

'না, আমার টাকা নয়। দরিদ্র শিক্ষয়িত্রী হতে পারি কিন্তু পরধনে আমার লোভ নেই কোনও। হককের টাকা পাইনে, এই দুঃখ। নাহক পরের টাকা হাতাবার আমার ইচ্ছা হয় না। আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে তো টাকাটা আমি ওকে দিয়ে দিতে চাই।'

'কাকে? ওই পকেটমারকে?' ট্রামসুদ্ধ লোক হতবাক।

'হ্যাঁ, ওকেই। নেহাত অভাবী না হলে পরের পার্সে হাত দিতে যায় কেউ? ওর-ই দরকার টাকাটার। ওকেই দেব।' বলে নোটখানা তিনি হর্ষবর্ধনের হাতে তুলে দিতে যান—'এটা তুমিই নাও— এ টাকা তোমারই টাকা—ধরো।'

'না, আমার টাকা নয়। কক্ষনও না।' ঘোরতর প্রতিবাদ হর্ষবর্ধনের।

'তোমার টাকা নয় যে তা আমি জানি। কিন্তু ভগবান তোমাকেই এটা দিতে চান—তোমার দুঃখকষ্ট জেনে। নইলে তুমিই বা কেন আমার পাশে এসে বসবে আজ, আর এই অবিশ্বাস্য কাণ্ডটা ঘটবে।'

'মাপ করুন, আমি নিতে পারব না।' হর্ষবর্ধনের সকাতর মিনতি 'আপনিই রাখুন টাকাটা। আপনার টাকাই।'

'না, আমার নয়। আমি ভালোই জানি। আমার মোটে তিনটি সিকি সম্বল...তবে আজই ইস্কুলে গিয়ে এ মাসের মাইনেটা পাব আশা করছি। নাও, ধরো'...

কিন্তু হর্ষবর্ধনকে না ধরার জন্য নাছোড়বান্দা দেখে—'বেশ, তাহলে ওই ছেলেটিকে দিয়েদি না হয়। হ্যালো, স্কাউট! টাকাটা এখন তোমার কাছেই থাক। সুবিধামতো কোনও সৎকাজে ব্যয় করো। কেমন?...এখানেই নামতে হবে আমায়। আমি নামলাম।'

কাঞ্চনের হাতে নোটখানা গছিয়ে সামনের স্টপে তিনি নেমে গেলেন।

মহিলাটির ভূমিকায় ট্রামসুদ্ধু সবাই যেন অভিভূত হয়েছিল। তিনি নেমে যেতেই সজাগ হয়ে উঠল সব!

'মহিয়সী মহিলা, উনি তোমাকে রেহাই দিলেন—তা বলে আমরা তোমায় ছাড়ছি না। পুলিশে দেব তোমাকে। থানায় যেতে হবে তোমায়।'

'এখানকার থানাটা কোথায় হে?' কন্ডাকটারকে একজন শুধায়।

'আমার তো জানা নেই, মশাই! বলতে পারব না।'

তারপর আরও এক সমস্যা দেখা দিল, কে লোকটাকে থানায় জমা দিতে নিয়ে যায়? সবাই ব্যস্ত বেজায়। সবারই আপিস টাইম এখন।

অবশেষে একজন বুঝি সমাধানের পথ খুঁজে পায়—

'ওই তো স্কাউট রয়েছে। বয়স্কাউটদের কাজই তো পাবলিক সার্ভিস—ওই জমা দিয়ে আসবে থানায়। বাপু স্কাউট, তুমি তো হাফ-পুলিশ হাফ-মিলিটারি—তোমারই উপযুক্ত কাজ। এই লোকটাকে নিয়ে গিয়ে পুলিশের জিম্মা করে দিতে পারবে না?'

'কেন পারব না সার।' হর্ষবর্ধনকে বাঁচাবার ফিকির পেয়ে সে খুশি হয়।

'তাহলে নিয়ে যাও পাকড়ে। যাও হে, ওর সঙ্গে নেমে যাও।'

হর্ষবর্ধন কাঞ্চনের সঙ্গ ধরতে যান, তাঁর পাশের সবল লোকটি বাধা দেয়—না, অমনি ছেড়ে দেওয়াটা ঠিক হবে না। তাহলে কী হল ওর? ওকে উচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার।'

হর্ষবর্ধন ট্রামটার থামবার জন্য নামবার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। কাঞ্চনও খাড়া। এমন সময় সেই লোকটি এসে তাঁর ঘাড় চেপে ধরে।

লোকটি তাঁকে অর্ধচন্দ্রদানে উদ্যত।

হর্ষবর্ধন নিতান্ত সঙ্কুচিত হয়ে পড়েন। কিন্তু কী করবেন, সমবেত জনমত তাঁর বিরুদ্ধে। পাদানির কাছে খাড়া হয়ে তিনি সমুচিত শিক্ষা লাভের জন্যই যেন অপেক্ষা করেন।

কন্ডাকটারের সময় বয়ে যাচ্ছিল। সেও ছিল কাছেই দাঁড়িয়ে; হাতের নাগালে পেছন থেকে সে এক ধাক্কা লাগায়—বেশ জোরালো এক ধাক্কাই।

'তুমি আমায় স্যুট করতে দিলে না হে!' গলহস্তকারী বলপ্রয়োগে বাধা পেয়ে কন্টাকটারের প্রতি কটাক্ষ

করেন ঃ 'কর্ণার কিকটা দেখিয়ে দিতাম কেমন। এমন কি কানটাও ধরতে দিলে না লোকটার! বাগড়া দিলে আমায়।' তাঁর আপসোস শোনা যায়।

কিন্তু সেই কনডাকটিং ধাক্কাতেই তিনি উড়ে গিয়ে রাস্তা জুড়ে পড়েছেন, চিৎপাত হয়ে পড়েছেন।

ঠিক হয়তো চিৎপাত নয়—উল্টো চিৎপাত বললে ঠিক হয়! উৎপাত হয়ে পড়েন বলা যায়।

ট্রামসুদ্ধ লোক হা হা হি হি হো হো হৌ হৌ করে হাসতে থাকে।

ঘণ্টা বাজিয়ে ট্রাম চলে যায় হাসতে হাসতে।

হর্ষবর্ধন পড়েই থাকেন উপুড় হয়ে। কোনও নড়াচড়া নেই তাঁর অনেকক্ষণ...নিবাত নিস্পন্দ!

'হর্ষবাবু! হর্ষবাবু!' কাঞ্চন কানের গোড়ায় গিয়ে ডাকে, কোনও হর্ষধ্বনি পাওয়া যায় না। কাঞ্চন তখন তাঁর পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দেয়। দিতেই হর্ষবর্ধন তিড়িং করে উঠে বসেন। বসেই থাকেন ঠায়। ভোম হয়ে যেন কি রকম।

কাঞ্চন তখন তাঁর বগলের তলায় সুড়সুড়ি লাগায়।

তড়াক করে লাফিয়ে ওঠেন তিনি।

'কী হচ্ছে এ-সব? ইয়ার্কি পেয়েছ?' হর্ষবর্ধন খাপ্পা হন।

'আপনার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করছিলাম।' কাঞ্চন জানায়, 'জল দিয়ে করাই দস্তুর। কিন্তু জল এখানে পাই কোথায়। তাই জলপথে না গিয়ে স্থলপথেই...'

'আমার বুঝি সুড়সুড়ি লাগে না?' হর্ষবর্ধনের রাগ হয় বেজায়।

'এতেও না হলে তখন অন্য পথ দেখতে হত। স্কাউটমাস্টার জুজুৎসুর কয়েকটা প্যাঁচ শিখিয়ে ছিলেন, তারই একটা কষতে হত তখন।'

'কী সু?'

'জুজুৎসু।'

'জুজুৎসু দেখাতে চাও আমায়?'

'হ্যাঁ, সেটা বেশ মজুবৎসই। তার আগে একটু সুড়সুড়ি দিয়ে দেখা যাক না—এটাই বেশি যুৎসই মনে হল আমার।' কাঞ্চন বলে ঃ 'নইলে সেই জুজুৎসই ছিল শেষ পর্যন্ত।

'জুজুর ভয় দেখানো হচ্ছে আমাকে? যাও, তোমার সঙ্গে আমার আড়ি।' গোমড়া মুখে হর্ষবর্ধন ধুলোর ওপরেই বসে পড়েন আবার—গুম হয়ে।—'আড়ি হয়ে গেল তোমার সঙ্গে। জন্মের মতন!'

'রাগ করছেন কেন দাদা?' কাঞ্চন গিয়ে হর্ষবর্ধনের গলা জড়িয়ে ধরে। তারপরে তাঁর মান ভাঙাতে একটুখানি আদর করে দেয়।

'এটা কী হল শুনি?'

'কী হল? মার রাগ ভাঙাতে যা করি—মা আমার রাগ ভাঙাতে যা করে—তাই করলাম—একটুখানি।'

'আমি কি তোমার মাতৃতুল্য?' রাগ পড়তে চায় না তাঁর—'এমন কি, পিতৃতুল্যও তো নই আমি।' দম নিয়ে আবার তিনি ফাটেন—'তোমার পুত্রতুল্য তো কখনই নয়।'

'দাদৃতুল্য তো বটেন।'

কথাটায় হর্ষবর্ধন হঠাৎ কেমন প্রসন্ন হয়ে ওঠেন—'হ্যাঁ, তা হতে পারি। দাদা তো আমি বটেই।'

বলেই তিনি নটরাজের ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ান—মহাদেবের বরাভয়মূর্তি ধরে অবলীলায় প্রকট হন—

'বৎস কাঞ্চন! বর প্রার্থনা করো। কী চাও বল? কখানা নোট দেব তোমায়? যা নেবে নাও। তোমাকেই আমি দিয়ে দেব সব।'

'কিচ্ছু চাই না আমার। কোনও বর নয়, কোনও নোট-ফোট না, বরং আপনার নোটখানাই ফিরিয়ে দিতে চাই আপনাকে...'

'না, না, ও নোট আমি নেব না। ও টাকা আমার নয়, মেয়েটির টাকা, সে তোমায় দিয়ে গেছে। আমি নিতে পারি না। তিনি বাধা দেন—'মেয়েটি দিয়ে গেছে তোমাকে সদ্ব্যয় করার জন্যে। পরের উপকারে খরচ করো টাকাটা।'

'পরোপকারের ঠ্যালা তো দেখলেন!' কাঞ্চন বলে, 'না, আমার আর সে কর্মে সাহস হয় না। টাকা দিয়ে কারও যথার্থ উপকার করা যায় না বোধহয়।'

হর্ষবর্ধন উঠে দাঁড়ান—'ও বাবা! এ যে দেখছি হাওড়া ব্রীজের সামনে এনে নামিয়ে দিয়েছে আমাদের।'

'এটা কি হাওড়া ব্রীজ? হাওড়া ব্রীজ আরও কত লম্বা-চওড়া না? এটা তো ছোটোখাটো পুল একটা।'

'চোখে কানে কি আর দেখতে পাচ্ছি ভাই! যা ধাক্কা খেয়েছি একখানা! সব গুলিয়ে গিয়েছে আমার...

'তাই বলে আপনি গুল মারবেন আমাকে?' কাঞ্চনের প্রতিবাদ ঃ 'এটা বোধহয়....আমার মনে হচ্ছে এটা মাঝেরহাট ব্রীজ।...'

'ও বাবা! ওপর দিয়েও ট্রাম যাচ্ছে আবার ব্রীজের তলা দিয়েও ট্রাম?' হর্ষবর্ধন অবাক হন।

'ট্রাম নয় ট্রেন। দেখছেন না! তলার ইস্টিশনে রেলের ইঞ্জিন দাঁড়িয়ে। ফোঁস ফোঁস করছে ইঞ্জিনটা। শুনছেন না?'

'তাই তো বটে! হর্ষবর্ধনের বিস্ময় ধরে না—'এ যে দেখছি ছোটোবেলার সেই পদ্যপাঠে পড়া—সেই ছড়াটার কথা মনে পড়ছে আমার। উপরে জাহাজ চলে নিচে চলে নর। অপরূপ আর কী বা আছে এরপর? পড়েছ তুমি পদ্যটা?...(সদ্য সদ্য ব্যাখ্যা করে দেন তক্ষুনি।) বিলেতে টেমস নদীর ওপর দিয়ে জাহাজ যায় আর তার তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ পথে যায় মানুষরা—সেই খবর এতে জানানো হয়েছে সুকৌশলে। বুঝেছ?'

'আমাদের এটাই তারচেয়ে কম কি জবর?' কাঞ্চন বলে ঃ

'এটাও কম খবর না—কম আশ্চর্যের নয়।' বলে সেও মুখে মুখে ছড়া কেটে দেয় তক্ষুনি—

'উপরে টেরাম চলে নিচে চলে ট্রেন।
এর চেয়ে আজব কি কিছু দেখেছেন?'

'বা বা! তুমি দেখছি কবিও আবার।' বাহবা দেন তিনি—'চলো নেমে ইস্টিশনে যাই। কিছু খাই-টাইগে এখন। সেখানে চা-টা পাওয়া যাবে নিশ্চয়।'

'ইস্টিশনে সব কিছু মেলে। চলুন খিদে পেয়েছে, আমারও।'

নেমে যেতেই দেখা গেল একটা পাঞ্জাবি দোকানে ঘোলের সরবত পাওয়া যায়।

'ঘোলই খাওয়া যাক, কী বলেন? তেষ্টাও পেয়েছে বেশ।'

'সকাল থেকেই তো ঘোল খাচ্ছি আজ।' হর্ষবর্ধন বলেন ঃ 'পৃথিবী আমার কাছে আর গোলাকার নেই। সব ঘোলাকার। ঘাড় ধাক্কাটা খাবার পর চোখের দৃষ্টিও কেমন আমার ঘোলাটে হয়ে গেছে।'

দু-গেলাস খাবার পর হর্ষবর্ধন ফরমাশ করলেন—'আউর দো গ্লাস।'

তারপর দাম মেটাতে গিয়ে একখানা একশো টাকার নোট বার করলেন।

'ইসকা তোড়ানি আব কৈসে মিলি?' দোকানদার ঘাবড়ায়।

'তব তুম ভি দু গিলাস খা যাও।'

'তব ভি নেহি হোগা।'

'তব এক কাম করো, যেতনা লোক আজ তুমহারা দুকানমে আয়েগা সব কো এক এক গিলাস পিলা দেও—মুফৎ। সমঝা? শও রুপিয়া দাম তক তামাম আদিমিকা—মেয়ে আদমি নিয়ে—পিলানে পিলানে যাও! বুঝেছ?'

'জো হুকুম সাব।'

দোকানদার সেলাম করে নোটখানা নেয়।

'আর ভাই ট্রামে চাপছিনে, বাসেও নয়কো আর। চলো এবার ট্রেনে চেপেই যাই কোথাও...যেদিকে দু-চোখ যায়। যেখানে আমার চোখে লাগে নেমে যাব সেইখানেই। অনেক দূরের কোনও অজ পাড়াগাঁয়। সেখানকার মানুষের শুনেছি ভারী দুঃখ কষ্ট—অনেক অভাব অভিযোগ। তাদের দেশেই যাই চলো আমরা।'

ট্রেনের ফোঁসফোঁসানি বাড়ছিল ক্রমেই। এবার যেন ককিয়ে উঠল গাড়িটা।

গার্ডসাহেব হুইসল দিলেন, ফ্ল্যাগ নাড়লেন.....ছেড়ে দিল ট্রেন।

এর ভেতরেই কাঞ্চন আর হর্ষবর্ধন উঠে পড়েছেন।

'উপযুক্ত প্রতিশোধ নিয়েছেন সবার ওপর।' গাড়িতে বসে কাঞ্চন বলল ঃ 'যেমন ঘোল খেয়েছেন...'

'শুধু ঘোল খাওয়া? ঘোলের ওপর ঘোল খেয়েছি আজ।'

'ঘোলে ঘোলক্ষয় হয়ে—যেমন বিষে বিষক্ষয় হয়ে যায়। আর তার শোধও তুললেন তেমনি...'

'শোধ তুললাম? কখন শোধ তুললাম?'

'একটু আগেই তো! সবাইকে ঘোল খাইয়ে ছাড়লেন। যতজন আজ ওই লোকটার দোকানের ধারে কাছে আসবে ঘোল না খেয়ে কি রেহাই পাবে কেউ? পাঞ্জাবিরা ভারী সৎ হয়। ঘোল না খাইয়ে ছাড়বে না সে কাউকেই। অন্তত দু-শো জনকে তো ঘোল খাওয়াবেই নির্ঘাত...'

কাঞ্চন হাসতে থাকে। হর্ষবর্ধনও।

।। নয় ।।

'না, এই দুনিয়ায় পরের উপকার করার উপায় নেই! করতে গেলেই কেউ উপকৃত হয় না, উল্টে এক করতে আর, আরেক রকম হয়ে দাঁড়ায়! উল্টো উৎপত্তি যার নাম!

প্রথম পরহিতচিকীর্ষার বিপরীত ফল দেখে তাঁর মেজাজ তখন খিচড়ে গেছে। বেশ ঘা খেয়েছেন তিনি...মনে এবং বাইরে, বাইরের চাইতে ভেতরেই বেশি এবং ছড়ে, ছেঁচড়ে, চটকে, দুমড়ে হতাশ হয়ে গেছেন। উৎসাহের অনেকখানিই তাঁর উপে গেছে তখন।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই তিনি কোমর বেঁধে বেরিয়েছিলেন পরের উপকার করবেন বলে। মরীয়া হয়ে লেগেছেন, কিন্তু এতক্ষণ বদ্ধপরিকর হয়ে থেকেও কটা লোকের কী উপকার করতে পারলেন?

ভাবতে ভাবতে, মেঘের ওপর যেমন মেঘ জমে, ভাবনার পর ভাবনা জমাট হতে থাকে। ভেবে দেখলে পৃথিবীর পরহিতপ্রয়াসীদের পথ চিরদিনই কি এমনি অপ্রশস্ত এহেন ক্ষুরধার নয়। এই রকম কণ্টকাকীর্ণই নয় কি? জগতের যে সব মহৎ লোক অকালে মহাপ্রয়াণ করেছেন, কেউবা ক্রুশ কাঠে কেউ বা ফাঁকা মাঠে, যিশুখ্রিস্ট থেকে শুরু করে যে সব মহাত্মা পরের ভালো করতে গিয়ে বেঘোরে মারা পড়েছেন—তাঁদের আর হর্ষবর্ধনের ইতিহাস কি এক নয় প্রায়? আর, প্রায়শই তো এমনটা হতে দেখা যায়।

আস্তে আস্তে আবার তাঁর প্রেরণা আসতে থাকে।

গুমগুম করে ছুটে চলেছে ট্রেন। তিনিও গুম হয়ে ভাবছিলেন। হঠাৎ মুখ তুলে জানালার বাইরে চোখ পড়তেই গুমরে উঠেছেন তিনি—বা বা বা!

জানালার বাইরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে আমবাগান, ধানের খেত, বাঁশের ঝাড়, মাটকোঠা, খড়ের চাল, পচা ডোবা, পানা পুকুর, পোড়ো বাড়ি, গোরুর পাল নিয়ে রাখাল বালকদলও চোখের পলকে পার হয়ে গেল।

'বা বা! কী সুন্দর ছবির মতন দৃশ্য সব।' তিনি ডুকরে ওঠেন।

'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি!' কাঞ্চন আওড়ায়—'মা বলিতে প্রাণ করে আনচান...'

'ঠিক জায়গায় এসে পড়েছি আমরা।' হর্ষবর্ধন বলেন ঃ এইখানেই শান্তি পাওয়া যাবে। হয়তো কারও কোনও উপকারেও লাগতে পারি—লেগে যেতে পারি হঠাৎ!

'একেবারে অজ পাড়াগাঁ।'

'কী পাড়াগাঁ?'

'অজ।'

'তার মানে?'

'অজো নিত্যো শাশ্বতোয়ম্।' কাঞ্চন আওড়ায় আবার।

'কী অং বং ছাড়ছ সব?'

'অং বং নয়, সমসকৃত।'

'তার মানে?'

'মানে ঠিক জানিনে, বাবাকে বলতে শুনি। মানে, যার কবে জন্ম হয়েছে কেউ জানে না। চিরকাল ধরে চলেছে, চিরটাকাল থাকবে—এই আর কি। মানে শুধাতে বাবা বলেছিলেন একদিন।'

'পাড়াগাঁ সম্বন্ধে এ-কথা বলা যায় বটে।' সায় দেন হর্ষবর্ধন ঃ 'আমি তো জন্ম থেকে পাড়াগাঁ দেখছি, আমার বাবাও দেখেছেন, তার বাবাও....তার বাবাও...মানে, বাবার বাবা আবার বাবা আবার বাবা সব্বাই দেখে আসছে পাড়াগাঁ সেই কবের বাবার কাল থেকে।'

'কিন্তু শহরের সম্পর্কে এ-কথা ঠিক বলা যায় কি? সেকালের ইন্দ্রপ্রস্থ কি তার দেখা যায়? পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের সঙ্গে তারও প্রস্থান! সে-যুগের শহর পাটলিপুত্র কি আর দেখতে পান?'

'না। তার বদলে পাটালি গুড় দেখা যায়।' তারপর একটু ভেবে নিয়ে বলেন—'সেটাও নেহাত খারাপ নয়। খেতে বেশ।'

'দেশে আমরা পাটালি গুড়ের টাকরা দিয়ে চিড়ে খেতাম।' কাঞ্চন জানায়; 'খাসা খেতে। খেয়েছেন কখনও?'

'না, কলকাতায় ফিরে খাব এবার। তিনি কন—'না, কলকাতায় ফিরছি না। কলকাতা তোমার আজও নিত; নয়, সেদিনকার বানানো। চার্ণক বলে একটা লোকের সৃষ্টি। চার্ণকের জব। সেখানে আর না।

'চার্ণকের জব? না জব চার্ণকের?'

সে-কথার জবাব না দিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন হর্ষবর্ধন! 'আহা! দেখে দেখে আশ মেটে না। চোখ জুড়িয়ে যায়। এই অজ পাড়াগাঁ দেখে যা আনন্দ হচ্ছে না আমার! ইচ্ছে করছে এই অজো নিত্যে নেমে পড়ি—নেমে এই অজো নিত্যর ওপর একটু নৃত্য করি।'

'নৃত্য করবেন?'

'হ্যাঁ। চেন টেনে গাড়ি থামাব।'

'না না। এই মাঠের মধ্যে গাড়ি থামালে পঞ্চাশ টাকা ফাইন হয়ে যাবে।' কাঞ্চন বাধা দেয়—'আর, সেটা খুব ফাইন হবে না।'

'কেন? আমাদের কি পঞ্চাশ টাকা নেই নাকি? আমার কাছে নোটের গোছা আছে। তবে হ্যাঁ...।' তিনি ভাবিত হন; 'মুশকিল হবে বলছ? আমার কাছে তো সব একশো টাকার নোট গার্ডের কাছে যদি ভাঙানি না থাকে?'

'না থাকতেই তো পারে।' কাঞ্চন বলে ঃ 'ট্রেনের গার্ড তো আর ট্রামের কন্ডাকটার নয় যে টাকার ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে ঘুরবে? যদিও ট্রেন আর ট্রাম—সেই লাইনের ওপর দিয়েই যায়।'

'এক কাজ করলে হয়। চুকে যায় তাহলেই...।'

'কী কাজ?'

'আমরা দু-জনে মিলেই একসঙ্গে চেন টানি না? আমি এধারের তুমি ওধারের চেনটা টান। তাহলে দুজনের ডবল ফাইন হয়ে পুরো একশো টাকাই দাঁড়াবে। একখানা নোট ফেলে দিলেই চুকে যাবে তখন।'

'দরকার কি চেন টানবার? একটু পরেইতো স্টেশন আসছে। সেখানেই নামব আমরা।'

'কিন্তু স্টেশন কি মাঠের মধ্যেখানে হয়? গাঁ-গঞ্জ অঞ্চলেই হয়ে থাকে?' হর্ষবর্ধনের গঞ্জনা—'এই গোরুচরা ঘাসজমি, এই ধানখেত এ-সব কি স্টেশনের ধারে-কাছে আছে?'

'স্টেশন ছেড়ে একটু এগুলেই পাব মাঠের পর মাঠ—এনতার মাঠ। আজো নিত্যো শাশ্বতোয়ং বলেছে না? সাতশো মাইল চলে গেছে এই গ্রাম।'

'কী যা-তা বকছ? এক একটা গ্রাম সাতশো মাইল হয় নাকি? মাথা খারাপ?'

'একটা গ্রাম কেন? গ্রামের পর গ্রাম—চলেই গেছে তো...মাইলের পর মাইল বরাবর। সাতশো মাইল পর পর একেকটা শহর।...বড় বড় শহরের কথাই বলছি।'

'সাত শতয়ং? সাতশো মাইল জুড়ে এই গ্রাম? বলছ তুমি?'

'বলছিই তো! যত খুশি নাচুন না! নাচতে নাচতে যান....যেতে যেতে নাচুন!'

বলতে বলতে একটা স্টেশন এসে পড়ল। তাঁরা নামলেন।

স্টেশনের সামনের পাকা রাস্তাটুকু পায় পায় পার হয়ে গাঁয়ের মেটে পথে তাঁরা পড়লেন।

'এই পাড়াগাঁই আমি মনে মনে চাইছিলাম, বুঝলে কাঞ্চন?' গোরুর গাড়ির পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে তিনি বললেন—'এই পাড়াগাঁই আমি চাই। এই অজ পাড়াগাঁ। এখানকার লোকরাই মানুষ। শহুরে মানুষরা কি আবার মানুষ? তারা যাচ্ছেতাই...'

'যা বলেছেন!' কাঞ্চন সায় দেয় তাঁর কথায়—'শহরের লোকেরা সন্দিগ্ধস্বভাব—সব কিছুতেই তাদের সন্দেহ। কেউ সত্যি সত্যি উপকার করতে গেলেও স্বভাবতই তারা সন্দেহ না করে পারে না... ....সবাইকেই সন্দেহের চক্ষে তাকায়! এই অজ পাড়াগাঁগুলোকে গিলেই তো শহরটহর হয়েছে। শহর হচ্ছে একটা একটা অজগর।'

'যা বলেছ ভাই!'

'এই অজ পাড়াগাঁতেই আমরা আসল লোকের দেখা পাব। যারা অভাবের মধ্যে আছে, দারিদ্রের যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট হচ্ছে যারা—তাদের সন্ধান মিলবে এইখানেই। যারা উপকার পাবার জন্যে লালায়িত, উপকৃত হলে চিরবাধিত হবে...বুঝেছেন?' কাঞ্চন তার ওপর আরও যোগ করে ঃ 'যারা সারাজন্ম আপনার উপকারের ঋণ স্মরণ করবে, কৃতজ্ঞতার বোঝা বয়ে কাতর হবে সারা জীবন। আপনি যে যথার্থ বদান্য, বদ বা অন্য কিছু নন—ঠাওর পেতে মুহূর্ত মাত্র যাদের বিলম্ব হবে না।'

'একটা বাগানের সামনে এসে পড়েছি আমরা।' হর্ষবর্ধন বললেন ঃ 'কারও বাগানবাড়ি হবে বোধহয়। কোনও বড়লোকটোকের।'

বাগানবাড়িটার গেটের মুখেই জনকত কালো ময়লা ছেলে সবুজ ঘাসের ওপর বসে জটলা পাকাচ্ছিল। তারা যে কোনও কিছুর জন্য খুব প্রয়োজন বোধ করছে তা মনে হল না। তবু তাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় হর্ষবর্ধন শুধালেন—'তোমাদের কারও কিছু চাই?'

ছেলেরা বলল ঃ 'কিছুই চাইনে।'

'আমরা কি খেলব ভাবছি তাই।'

'ডাণ্ডাগুলি না মার্বেল—কী খেলা যায়।'

'চোর-পুলিশ খেল।' বাতলাল তাদের একজন।

'এখানে বাগানের ভেতর লুকোবার জায়গা কোথায় রে?'

'কেন গাছের আড়ালে।...গাছের ডালে। কত জায়গা আছে।' তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে তাদের সোচ্চার আলোচনা চলতে লাগল।—'গাছের ডালেই ওঠা যাক লাফিয়ে।'

'তাহলে লেজ দরকার।' তাদের কথার ওপর এই কথা বলে কাঞ্চনরা এগিয়ে চলল।

'বেশ বলেছ ভাই।' কাঞ্চনের টিপ্পনীর তারিফ করলেন তিনি। উপকৃত হবার একান্ত অনীহা দেখে ছেলেদের প্রতি তাঁর চিত্ত চটে গেছল।

'আরে আরে এই নির্জন বাগানের মধ্যে একটা লোক বসে রয়েছে দেখেছ?' হর্ষবর্ধন কাঞ্চনের চোখ টানেন—'ওই যে ওইখানে। বেঞ্চির উপর একটা বুড় মতন লোক।'

'বিষণ্ণ। জরাজীর্ণ। দুঃখদুর্দশার ছায়া ওর চেহারায় হতাশার জীবন্ত প্রতিমূর্তি। দেখছি বটে!'

'এখানে বসে বসে কী যেন মতলব ভাঁজছে...কী তোমার মনে হয়?'

'চুরি ডাকাতির নয়। বুড় মানুষের সাধ্যে ও-সব কুলোবে না।'

'তাহলে কিসের মতলব তোমার ধারণা?'

'মাছ ধরবার মনে হয় আমার। সামনে পুকুর রয়েছে দেখছেন না?'

'মোটেই মাছ ধরবার নয়। মরবার মতলব আঁটছে লোকটা।' হর্ষবর্ধন বাতলান—'হয় ওই পুকুরে ডুবে মরবে, না হয়তো বিষ খেয়ে।'

'অ্যাঁ বলেন কি?' আঁতকে ওঠে কাঞ্চন।

'আত্মহত্যার আগে মানুষ এই রকম অবস্থায় এসে পৌঁছায়।' তিনি জানান—'এইরূপ—বিমর্ষ দশায়।'

'ভারী খারাপ তো তাহলে। ওকে কি বাঁচানো যায় না?'

'চেষ্টা করে দেখতে হয়। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে যদি পারা যায় তো দেখি। তুমি এইখানে দাঁড়াও। আমি ওর কাছে যাই। দুজনে একসঙ্গে গেলে লোকটা ভড়কে যেতে পারে।'

কাঞ্চনকে দাঁড় করিয়ে তিনি এগিয়ে যান।

পরোপকারের প্রেরণায় তাঁর বুকটা ধকধক করে। জনৈক পরলোকযাত্রীকে তার চরম মুহূর্তে বাঁচাতে চলেছেন তিনি। অন্তিম মুহূর্তে তার জন্য কী আশ্বাস নিয়ে যাবেন? তিনি ভাবেন।

কিন্তু ভাববার সময় তাঁর হাতে কই? প্রত্যেক পর মুহূর্তে যখন দারুণ দুর্ঘটনার আশঙ্কা? প্রতি পদক্ষেপেই যখন তিনি মৃত্যুর দিকে এগুচ্ছেন—হলই না বা নিজের মৃত্যুর, কিন্তু মৃত্যু তো একটা বটে!

লোকটার হাতের তালুতেই হয়তো আফিমের তাল, সঙ্গোপনেই দলা পাকাচ্ছে এখন। হাতের সঙ্গে মুখের হাতাহাতি—কিংবা মুখোমুখি—হয়ে যেতে কতক্ষণ আর? তার পরেই তো চিচিং ফাঁক।

হর্ষবর্ধন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সন্তর্পণে মৃত্যুপথযাত্রীর শিয়রে গিয়ে পৌঁছন।

প্রায় যমদূতের মতোই। অন্তত লোকটা তাঁকে দেখে তেমন ধারাই চমকে ওঠে যেন....'অ্যাঁ কে? কে এখানে?'

হর্ষবর্ধন বলেন—'ছি, ভাই।'

লোকটি একটু হতচকিতই যেন।

'ছি ভাই, ও কাজ কি করতে আছে?' বনেদী চালে তিনি মাথা চালেন, 'উঁহু, এ কাজ ভালো নয়। আদৌ ভালো না।'

আকস্মিক আক্রান্ত লোকটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে থাকে। তার মুখ দিয়ে কোনও কথা সরে না।

'ছি, আত্মহত্যা করা পাপ। তাছাড়া ভারী খারাপ।' হর্ষবর্ধন বলতে থাকেন ঃ 'কেন মরতে যাবে ভাই? মরবার তোমার বয়েস হয়েছে? তোমারও হয়নি, আমারও না। তিনকাল গেছে তো কী, আমার অবশ্যি আড়াই কাল, তাহলেও এখনও বহুকাল আমরা টিকে থাকব।' উপদেশবর্ষণ চলতে থাকে তাঁর—'থাকব না তো কী? কে আটকায়? দেখ ভাই, আকাশ কেমন নীল, মাঠ কেমন সবুজ, সামনে পুকুরের জল কেমন টলটলে! গাছে কোকিল ডাকছে...গাছে নয়, বোধহয় কারও বাড়ির খাঁচায়, তা হোক ডাকছে তো? কী মধুর স্বর! গোরু মাঠে ঘাস চিবুচ্ছে—ওই যে দেখ না! সামান্য একজন গোরু সেও মরতে প্রস্তুত নয়। প্রাণত্যাগ করতে রাজি নয় সেও—তুমি কেন মরবে ভাই?'

'যাচ্চলে!' বুড় লোকটি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে ঃ 'কে হে বাপু? কে তুমি? তোমাকে তো আমি সাত জন্মে চিনিনে। কস্মিনকালেও না। কী মতলবে এখানে আসা হয়েছে শুনি?'

হর্ষবর্ধন যেন ধাক্কা খান! এ হেন প্রত্যুত্তরের জন্যে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। কী বলবেন ভেবে পান না। কিন্তু লোকটি তাঁর জবাবের অপেক্ষায় না বসে থেকে তড়িদ্বেগে উঠে তৎক্ষণাৎ গাছপালাদের মধ্যে পালিয়ে যান। আর তার পরমুহূর্তেই আরেকটি কণ্ঠ বেশ তীক্ষ্ণ, রূঢ় এবং কটু কিঞ্চিৎ দূরত্ব থেকে ক্রমশই সমীপবর্তী হতে থাকে।

'এই! এই যে! হুঁয়া কোন হ্যায়? কৌঈ চোট্টা আদমী? খাড়া রহো! ভাগো মৎ! যাতা হ্যায় হাম...!

হর্ষবর্ধন খাড়া থাকেন।

খানিকক্ষণ।

কিন্তু যেমনি না সেই কটুকণ্ঠ গাছের আড়াল থেকে ইয়া ইয়া একজোড়া পাকানো গোঁফে পরিবর্তিত হয়ে আসে, তাকানো মাত্রই তাঁর চোখে পড়ে। তারপর আর তিনি খাড়া থাকা খুব সমীচীন বোধ করেন না। সবটাই ভারী খারাপ লাগে তাঁর।

না, বলির পাঁঠার মত খাঁড়ার সামনে খাড়া থাকার কোনও মানে হয় না। এইভাবে কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে থাকাটাও ভারী বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। কেমন যেন বিসদৃশ বিসদৃশ ঠেকে।

চটপট পা চালিয়ে যে পথে তিনি এসেছিলেন সেই পথেই সরে পড়েন।

কাঞ্চন তাঁর আগেই সরেছিল। দূর থেকে ওই দৃশ্য দেখেই না দুর্ঘটনার আঁচ পেয়ে বাগানের বেড়া টপকে তিন-লাফে সে বাইরের রাস্তায় গিয়ে খাড়া।

কিন্তু ছাড়াছাড়ির কথা নেই। খাঁড়াটাও এগিয়ে আসে। গোঁফের দোরোখা ছুরি ফলাও করে উঁচিয়ে সে হর্ষবর্ধনকে জিজ্ঞেস করে—'কেঁও? রায়বাহাদুরকো কাহে-সে দিক দিয়া! কেঁও? কেঁও??'

তার প্রশ্নে হর্ষবর্ধন যেন কুঁকড়ে যান। লেজ গোটানো কুকুরের মতোন তিনিও যেন কেঁউ কেঁউ করতে থাকেন—মনে মনে।

।। দশ ।।

কিন্তু বেশিক্ষণ লেজস্বী কুকুরের মতন নিজের মধ্যে লেজ গুটিয়ে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। তেজস্বী হর্ষবর্ধনের সেটা স্বভাববিরুদ্ধ।

'কাহে? কেন বাবা?' কোনওরকমে তিনি শুধিয়েছেন।

দারোয়ান বাবা তার কোনও জবাব না দিয়ে বলেছে—'তুরন্ত্ লে যায়ে গা...আভি আয়ে গা। ঠাহ্‌রো।'

দারোয়ান তাঁর গোঁফ চুমড়ে বলল, 'খাড়া রহো! হাম আভি আতা হ্যায়। তুমকো থানামে পাকড়কে লে যানে পড়ে গা।'

বলে একটুক্ষণের জন্যে সরে না যেতেই তিনি কাঁপতে শুরু করেছেন। দারোয়ানটা তাঁকে বাঁধা-ছাঁদার জন্যে দড়ি-দড়া লাঠি-সোটা আনতেই গিয়েছে সম্ভবত তারপর ফিরে এসে কিংবা থানায় নিয়ে দানাদদন পেটাবে...এভাবে কারও পেটোয়া হওয়া তাঁর ভালো লাগে না।

দারোয়ানের তুরন্ত্ আগমনের আশ্বাসে একটুও আশ্বস্ত না হয়ে তাঁর দুরন্ত মন সুদূরপরাহত হতে চায়।

তিনি শর্ট-কাট করে বাগানের এলাকা পেরুতে যান, ফুলের কেয়ারি-করা কাঁকর-বিছানো সোজা পথ না ধরে সামনের কাঁটা তারের বেড়া টপকে পড়েন।

টপকাতে গিয়ে তাঁর পিঠ পেট আর কোমর ছেঁচড়ে যায়, ভুঁড়িতে ভূরি ভূরি আঁচড় পড়ে তাছাড়া কাছার আধখানা কাঁটা তারে ছিঁড়ে আটকে থাকে।

তাঁর কোনও কসুর নেই, ডিঙোবার সময় তারটাই কাছা টেনে ধরে—পূর্বজন্মের শত্রুতাবশে কি দারোয়ানের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তা তিনি বলতে পারেন না। কী করবেন, যে করেই হোক বেড়ার কাছছাড়া হবার তাড়ায় কাছাছাড়া হয়ে নিজেকে মুক্ত করে এনেছেন।

মুক্তকচ্ছ হর্ষবর্ধন ভুক্তাবশিষ্ট কাছাকে, কাছার নামমাত্রকেই, যথাস্থানে বিন্যস্ত করার দুঃসাধ্য প্রয়াসে ব্যাপৃত, বাগানের দারোয়ান পাগড়ি মাথায় লাঠি হাতে তাঁর সামনে আগুয়ান হয়ে আসে। নিজের পরিচয়-পত্র আনতেই সে গিয়েছিল বোঝা যায়। শিকারী বেড়ালের প্রমাণ যেমন তার গোঁফেই, দারোয়ানের সার্টিফিকেটও সেইরূপ তার মাথায় আর হাতে—লাঠি আর ওই পাগড়িতেই।

'কেয়া নাম বাৎলাও তো! রহতেও কিধর? কৌন কাম করতে হো?....চলো ফাঁড়িমে।'

এক নিশ্বাসে সে তার তাবৎ বক্তব্য নিঃশেষ করে।

হর্ষবর্ধন তার পাকানো সূচ্যগ্র গোঁফের দিকে ভ্রূক্ষেপ করেই চোখ নামিয়ে নেন, ঘাড় হেঁট করে অধোবদনে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকেন। ফাঁড়া যে কাটেনি, ফাঁড়ি সামনে—সেই কথাই তাঁর মনে হতে থাকে কেবল।

'রায় বাহাদুরকো কাহে দিক কিয়া? কেয়া, কুছ ভিখ মাঙনে আয়া থা?'

হর্ষবর্ধনের তথাপি কোনও কথা নেই। ব্রীড়াবনত চোখে পায়ের নখে শহরতলির মাটি চাঁচছেন।

'যাও যাও! ভাগ যাও! ভাগো হিঁয়াসে—আউর কভি ইধর ঘুসো মৎ!'

মৌনাবলম্বীর সঙ্গে কথায় না পেরে উঠে পরাস্ত দারোয়ান স্বস্থানে প্রস্থান করে।

হর্ষবর্ধনের আবার হাঁটা শুরু হয়! তাঁর কাছা পৎ পৎ করে উড়তে থাকে পেছনে। পেছনেই বটে, তবে তাঁর অব্যবহিত পেছনে নয়, দক্ষিণে হাওয়ায় গা ঢেলে দিয়ে কাঁটা তারে লটকানো তাঁর অধিকাংশ কাছা জয়পাতাকার মতোই হেলেদুলে ওড়ে।

বেড়ার জিম্মায় নিজের লাঙ্গুল জমা রেখে ছিন্নদেহে ভিন্নকচ্ছ হর্ষবর্ধন লোকশ্রুত শেয়ালের ন্যায় নিজেকে পরাজিত জ্ঞান করেন। পরের ভালো করার দুঃখ কম নয়, সে-পথে লাঞ্ছনাও ঢের, বিপদও যৎপরোনাস্তি, কিন্তু এত সব সয়েও যদি সত্যিই পরের ভালো করতে পারতেন! তাহলেও তার কিছু সান্ত্বনা ছিল। কিন্তু পরের ভালো করা যায় কোথায়? পরের ভালো তো হয়ই না, মাঝখান থেকে যারপরনাই নিজের খারাপ হয়ে যায় কেবল।

'দূর্ দূর!'—নিজেকে আর তামাম দুনিয়াকে এক সঙ্গে তিনি ধিক্কার দেন—'নাঃ, পৃথিবীতে কারও কখনও ভালো করতে নেই।'

আকস্মিক বিপর্যয়ে ভুলে গেছলেন, হঠাৎ এখন তাঁর মনে পড়ে যায়, কেবল কাছাই নয় আরেকটা কী যেন তাঁর কাছাকাছি নেই সম্প্রতি। পাশাপাশি যার থাকবার কথা সেই ছেলেটি গেল কোথায়?

কাঞ্চন বলে কয়েকবার হাঁক পাড়তেই একটা গাছের শীর্ষদেশ থেকে সাড়া পাওয়া গেল তার। অদূরে সেই ভোজপুরীর প্রাদুর্ভাব দেখেই না, সে তরতর করে একটা গাছের মগডালে উঠে পাতার আড়ালে লুকিয়ে বসেছিল। নেমে এল এখন।

যে কাঁটা তারের বেড়া টপকাতে ভূরিশ্রবা হর্ষবর্ধনকে ক্ষত-বিক্ষত হতে হয়েছে কাঞ্চন তা একলাফে অবলীলায় পেরিয়ে এল। একটি মাত্র হাইজাম্পের কুদরতে। ছাগলছানার মতো কুদেই চলে এল সে।

'ভোজপুরিটাকে লাঠি হাতে এগুতে না দেখেই আমি, বুঝেছেন, আমি রামজীকে স্মরণ করেছি। রামজী হচ্ছেন ভোজপুরিদের দেবতা। আর তার পরেই ঠাকুর হল-গে হনুমানজী! তারপরই আমি হনুমানজীকে স্মরণ করে যথাস্থানে উঠে গেলাম। সামনেই ছিল গাছটা। একেবারে তার মগডালে।'

'দেখেছি। তবে গাছে উঠতে দেখিনি, নামতে দেখলাম।' হর্ষবর্ধন কনঃ 'একেবারে মগডালে গিয়ে উঠেছিলে?'

'হ্যাঁ, মগের মুল্লুকে মগডালই তো নিরাপদ। আপনি কিন্তু উঠতে পারতেন না। আপনার ভারে মগের মুল্লুক ভেঙে পড়ত!'

'হুম্!' হুঙ্কার ছেড়েই হর্ষবর্ধন গুম।

'ভোজপুরিরা ভারী মারাত্মক হয় তা জানেন? কেবল দু-রকমে ওদের খুশি করা যায়; এক, পুরির ভোজ দিয়ে, আর দুই, গান গেয়ে।'

'শুধুই গান, নাকি, নেচে নেচে গাইতে হয় আবার?'

'না, ওদের একটা প্রিয় গান আছে—তাই গাইলেই ওরা খুশি। গাইব শুনবেন?'

কাঞ্চন হাত-মুখ নেড়ে তার জানা গানটা ধরে—

নৌতুন ডালে নৌতুন নৌতুন ফুল ফুটিয়েসে...
নৌতুন ডালে নৌতুন নৌতুন ফুল ফুটিয়েসে...
আরে নৌতুন ডালে নৌতুন নৌতুন...

'কী হয়েছে এদিকে দেখো। ভুঁড়ির কী দশা করছে আমার!' হর্ষবর্ধন নিজের শতছিন্ন ভুঁড়ির প্রদর্শনী উদঘাটন করেন।—'কাঁটা তারগুলো কীরকম হুল ফুটিয়েসে এখানে, দেখ একবার!'

'আমার মতোন লাফ মেরে পার হয়ে আসতে পারলেন না বেড়াটা?'

'আমি কি তোমার মতোন টিঙটিঙে ফড়িং নাকি? ওই উঁচু বেড়া লাফিয়ে পেরিয়ে আসা আমার কম্মো? এই পেল্লায় দেহ নিয়ে।' তিনি বলেন—'তবে শুনে রাখো, এই আমার নাক মলছি কান মলছি——আর আমি কখনও কারও উপকার করব না! দেখলাম, এই দুনিয়ায় কেউ উপকৃত হতে চায় না।'

'আমাকে একটা পয়সা দেবেন বাবু!' বিশীর্ণকায় এক বালক বিবর্ণ মুখে তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়ায়ঃ 'ক-দিন থেকে কিছু খেতে পাইনি।'

পৃথিবীতে তাঁর প্রতিজ্ঞা পড়তে না পড়তেই তিনি আকাশ থেকে পড়েছেন। অ্যাঁ? এ কী? এ যে একেবারে অপ্রত্যাশিত ব্যাপার! মেঘ না চাইতেই জল? যার জন্যে তিনি এমন হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছেন, কোথাও সুবিধে করতে পারছেন না, সেই সুযোগ তাঁর সামনেই? একেবারে হাতের গোড়ায়! মুঠোর মধ্যে?

তিনি ভালো করে চোখ রগড়ে নেন। সত্যিই বটে! উপকারপ্রার্থী অযাচিত ভাবে উপচিকীর্ষুর সম্মুখে এসে হাজির, মিথ্যে নয়! মুক্তকণ্ঠে তাঁর কাছে সাহায্য ভিক্ষা করছে। মুক্তহস্তে।

তাঁর মুক্তহস্ত হবার মোক্ষম সুযোগ! হর্ষবর্ধন এক নিশ্বাসে আকাশে উঠে যান সটান!

তারপর আবার তাঁর পা মাটিতে ঠেকলে ভালো করে তিনি তাকিয়ে দেখেন। হ্যাঁ, উপকার করবার উপযুক্ত পাত্রই বটে—হুবহু ঠিক যেমনটি তিনি চাইছিলেন।

'একটা পয়সা! একটা পয়সা নিয়ে তুমি কি করবে? এক পয়সায় কী হবে? তাতে কি পেট ভরবে তোমার? ক-দিন ধরে খাওনি তুমি বলছ! ইস্! কী রোগাই না হয়ে গেছো—বাবা! তুমি বরং এই নোটখানা নাও...'

একশো টাকার একটা নোট তার হাতে তুলে দিয়ে বলেন—'এইটে নাও। এতে অন্তত একশো দিন ধরে পেট ভরে তুমি খেতে পাবে! যা তোমার খুশি। দু-দিনে চেহারা ফিরে যাবে তোমার।'

'না বাবু! এই জলছবি নিয়ে আমি কী করব?' ছেলেটা নোটখানা ফিরিয়ে দেয় তাঁকে—'আমাকে আপনি একটা টাকা দিন তাহলে একদিন পেট ভরে খাই। একদিনই ঢের। তাহলেই হবে আমার।'

'টাকা কোথায় পাব ভাই? টাকা-পয়সা একদম আমার নেইকো।' হর্ষবর্ধন জানান—'তুমি আমার ট্যাক হাতড়ে দেখো না হয়।'

ছেলেটি পকেটের ফাঁকে উঁকি মেরে দেখে—সবই সেই জলছবি ভর্তি। সে বলে—'বড় বড় ছবি নিয়ে আমি কী করব! ওতে কি আমার পেট ভরবে?'

হষবর্ধন কাঞ্চনকে বলেন তখন—'তোমার কাছে একটা টাকা থাকে তো ধার দাও এখন। পরে এই নোটখানা ভাঙিয়ে দেব না হয় তোমায়।'

কাঞ্চনের থেকে টাকাটা নিয়ে ছেলেকে দিতেই সে চিলের মতোন ছোঁ মেরে নিয়েই না ছুট মারে তক্ষুনি। দাঁড়ায় না আর। কোথায় উধাও হয় কে জানে!

হর্ষবর্ধন হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন।

আস্তে আস্তে তাঁর মুখ আকর্ণ হাসিতে ভরে যায়। দেখতে দেখতে গভীর হর্ষে তিনি বর্ধিত হন। দশগুণ যেন বেড়ে হঠাৎ। তাঁর বুক গর্বে ফুলে ওঠে। এতক্ষণের সমস্ত দুঃখ এক নিমেষে কোথায় মিলায়, এক পলকের আচমকা বৃষ্টিতে ধূসর মরুভূমি জলে ভেসে যায় যেন, কোথা থেকে যেন ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে তাঁর গায়ে লাগে, তিনি উছলে উছলে ওঠেন। কোনও অজানা উৎস তাঁর অন্তরে যেন খুলে গেছে হঠাৎ! কিসের নতুন উৎসব সেখানে উৎসারিত।

'আমার ভারী আনন্দ হচ্ছে ভাই! কেন জানি না, নাচতে ইচ্ছে করছে আমার। তুমি সেই নতুন ফুল ফোটার গানটা গাও তো! আমি তালে তালে নাচব!'

কিন্তু নাচ গানের আসর জমাবার আগেই আচম্বিতে বাধা লাগে। দস্তুরমতন এক স্থূল মহিলা হুলস্থূলের মতোই দাঁড়ায় এসে সামনে। খ্যানখেনে গলায় জিজ্ঞেস করে—'আমার বাছাকে তোমরা দেখেছ বাছা?'

'না বাছা।' ঘাড় নাড়ে কাঞ্চন।

'কি রকম বাছা?' হর্ষবর্ধন শুধান।

'হাড়-গোড় বার করা লিকলিকে চেহারা। এই পেটজোড়া পিলে—দেখেছ তাকে? সেদিন শক্ত ব্যামো থেকে উঠেছে—বিছানা ছেড়েছে সাত দিনও হয়নি, তেলেভাজা যা-তা খায়। এত বারণ করি কিছুতেই মানে না। পয়সা পেয়েছে কি অমনি বেগুনি কিনে খাবে। বেগুনি আলুর চপ ডালবড়া ঝালবড়া ঘুগনি পেঁয়াজি খাবার যম। এই সব যা-তা খেয়ে শক্ত ব্যামোটা বাধিয়েছিল...'বকবক করতে থাকে মেয়েটা ঃ 'টাইফয়েড থেকে যা করে ওকে বাঁচিয়েছি মা-কালীই জানেন। ঘটি বাটি বাঁধা পড়েছে। ডাক্তার বলেছে ফের তেলেভাজা খেলে এবার হলে ওকে আর বাঁচানো যাবে না! ওই যে আমার অন্ধের নড়ি, তিন কূলে কেউ নেই আর আমার। কিন্তু কত করে আগলাব? কি করে সামলাব ওই দস্যিকে? আমার হাড় জ্বালিয়ে খেলে। কোন দিকে গেল দেখ! ক-দিকেই বা নজর রাখি—কোন দিকটা সামলাই? যাই, একবার বেগুনির দোকানটা দেখিগে...'

গজগজ করতে করতে চলে যায় মেয়েটা।

হর্ষবর্ধন আর কাঞ্চন পাশাপাশি হাঁটেন। চুপচাপ। কারও মুখে একটি কথা নেই।

মেয়েটার গজগজানি তাদের গঞ্জনা দেয় বোধহয়।

হঠাৎ ফোঁস করে ওঠেন হর্ষবর্ধন—'সৎকাজে পুণ্য হয় জান? মানো?'

'মানে?' কাঞ্চন ওঁর কথাটা ধরতে পারে না ঠিক।

'মানে, পুণ্য কাজ করলে স্বর্গবাস হয়। হবেই নির্ঘাত। বিশ্বাস করো তুমি?'

'হ্যাঁ, বাবাও ওই কথা বলতেন বটে। বলতেন পুণ্য করলে স্বর্গ এড়ানো নাকি ভারী শক্ত ব্যাপার।'

'কিন্তু দেখো কী বিদঘুটে কাণ্ড! দান করাটা পুণ্য, আমি করলাম পুণ্য কাজ, আর স্বর্গবাস হতে যাচ্ছে ছোঁড়াটার। কী বিচ্ছিরি ব্যাপার দেখো একবার!'

বলে হর্ষবর্ধন একেবারে গুম হয়ে যান! ছেলেটার আসন্ন স্বর্গবাসের সম্ভাবনায় বিড়ম্বিত হয়েই বোধহয়!

একটু পরেই গুমরে ওঠেন আবার—'না আমি ওকে পয়সা দিই না ও বেগুনি খায় আর না ওর...' তারপর আর তাঁর কথা ফোটে না। ভাবতে গিয়ে নিজেই তিনি বেগুনি হয়ে যান।

'আপনি কেন দুঃখ করছেন? আপনি তো ইচ্ছে করে জেনে শুনে বেগুনি খাবার জন্যে ওকে দেননি, ও তো ওই টাকায় দুধ কিনেও খেতে পারত। দুধ কত পুষ্টিকর জিনিস—খুব মুখরোচক নয় যদিও। হিতকর জিনিসগুলো খেতে প্রায়ই তত ভালো হয় না। কিন্তু ওই দুধ, কি বার্লি কিংবা শঠিফুড না খেয়ে, শঠতা করে যদি সে বেগুনি গ্রহণ করে সেটা ওর নিতান্তই গ্রহবৈগুণ্য। আপনি তার কী করবেন?'

'ওই কথা বলে তুমি আমায় সান্ত্বনা দিতে চেয় না। বিবেক বলে একটা বস্তু আছে জান কি? মনের মধ্যে থাকে, সেখানে থেকে খচ খচ করে! জুতোর কাঁটার মতোই অবিকল—চলতে ফিরতে মনের মধ্যে লাগে কেবল। এখন সারাজীবন ধরে আমাকে বিবেকের দংশন এই খচখচানি সইতে হবে?'

হর্ষবর্ধন মনের মধ্যে খোঁড়াতে খোঁড়তে হাঁটেন।

'আপনি একটু দাঁড়ান। আমি দৌড়ে এক চক্কর মেরে চারধারটা দেখে আসি একবার। এর মধ্যে আর কদ্দূর গেছে ছেলেটা! দেখতে পেলে টাকাটা কেড়ে নেব তার কাছ থেকে।'

'না না, কাড়তে হবে না। তার চেয়ে বরং...'

হর্ষবর্ধনের বরং বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই তার রাইট কথাটা যোগায় যেন।

'বরং এখানকার কোনও মনোহারি দোকান থেকে এক কৌটো রবিনসন বার্লি কিনে দিয়ে আসব না হয়। কিংবা শঠিফুড।'

বলেই সে দৌড় মারে। হর্ষবর্ধন সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকেন—কাঞ্চনের ফেরার অপেক্ষায়।

খানিকটা যেতেই কাঞ্চন ছেলেটাকে দেখতে পায়। এক তেলেভাজা দোকানের পাশে বেগুনিজর্জর অবস্থায় বসে আছে।

প্রকাণ্ড এক ঝুড়ি বেগুনি আর পাঁপরভাজা নিয়ে মহা সমারোহে সে সেবা করতে লেগেছে।

কাঞ্চন আস্তে আস্তে তার দিকে এগোয়।

তাকে আসতে দেখেই ছেলেটা দাঁড়িয়ে ওঠে। কেমন যেন তার সন্দেহ হয় যে কাঞ্চন তার বেগুনিতে ভাগ বসাবার মতলবেই আসছে। ছেলেরা বোধহয় অন্তর্যামী; কেমন করে যেন পরের মনের কথা টের পায়! আর টের পেতেই না, তেলেভাজার ঝুড়ি সমেত ছুটতে শুরু করে।

কাঞ্চনও পিছু পিছু দৌড়োয়।

ছেলেটা এর কুঁড়ের ভেতর দিয়ে ওর গোয়ালঘরের বগল ঘেঁষে তার আস্তাকুড়ের পাশ কাটিয়ে কোথায় যে পালিয়ে যায় তার পাত্তাই পাওয়া যায় না। কাঞ্চনও এ-বাড়ির আনাচ ও-বাড়ির কানাচ ধরে তার পিছু ছুটতে থাকে।

এদিকে কাঞ্চনের অবর্তমানে হর্ষবর্ধন এক কাণ্ড বাধিয়ে বসেছেন।

এক আধবুড়ী আনাজপাতির ঝুড়ি মাথায় বোঝার ভারে কাতর হয়ে হাঁটছিল। সেই দৃশ্য দেখেই না, তাঁর পরহিতচিকীর্ষু প্রাণ উসখুস করে ওঠে—পরের গুরুভার বহন করে হালকা করে দেবার বাসনা আবার তাঁকে পেয়ে বসে হঠাৎ। তিনি মেয়েটির কাছে পায়ে পায়ে এগিয়ে যান।

মোলায়েম কণ্ঠে মিঠে করে বলেন—'দাও মা, তোমার ওই বোঝাটা দাও আমায়। আমি ঘাড়ে করে তোমার বাড়িতে বয়ে দিয়ে আসছি।'

মেয়েটি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকায়—'ও তুমি! তুমিই বুঝি? তুমিই বুঝি সেই লোকটা?'

'আমি? আসি কি?' হর্ষবর্ধন একটু ঘাবড়ে যান—'সেই লোকটা কী?'

'হ্যাঁ, তুমিই।' কর্কশ কণ্ঠ প্রকাশ পায় মেয়েটার—'তুমিই তো! পচার মার কাঁখ থেকে গুড়ের নাগিরি নিয়ে পগার পার হয়েছিলে না? সাত দিনও হয়নি যে গো! এর মধ্যেই ভুলে গেছ এখুনি?'

'কে পচার মা?' তিনি আমতা আমতা করেন।—'আমি তো তাকে চিনি না।'

'যার গুড়ের নাগরি পাচার করে দিলে—আবার বলছ কে পচার মা? আর তাকে চিনবে কেন? তবে আমি তোমায় চিনতে পেরেছি। তোমায় চিনতে পারিনি ভাবছ? ভালো চাও তো সরে পড়। এক্ষুনি পালাও এ তল্লাট থেকে।'

'আমি? আমি কেন পালাব?' হর্ষবর্ধনের ধোঁকা লাগে।

'কেন পালাবে! পালাতে দিচ্ছে কে! একবার পালিয়ে পার পেয়েছ বলে ভাবছ যে...কিন্তু জান না কি, বার বার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান...ঘুঘু দেখেছ যাদু, ফাঁদ দেখনি তো!

'আমি কেন ধান খাব! ধান খেতে যাব কেন?' তিনি ঘাবড়ান। 'আমি কিছু খেতে চাই না। ধান তো নয়ই...ঘাসও না। আমি ওই ঝাঁকাটা তোমার বাড়িতে বয়ে দিয়ে আসতে চেয়েছি কেবল।'

'হ্যাঁ! বাড়ি বয়ে দিয়ে আসছি বলে যেমন পচার মার গায়ে পড়ে গুড়ের নাগরি নিয়ে সরে পড়েছিলে! তেমনি গায়ে পড়ে আমার বোঝা হালকা করতে এসেছ। তা আমি টের পাইনি নাকি? পচার মার কান্নায় সাত রাত্তির ঘুম হয়নি পাড়াপড়শির...ডাকব পচার মাকে? হাঁক পড়ব? আবার বলা হচ্ছে আমি পালাব। মরে যাই আর কি!'

'আমি নই। আমার মতো অন্য কেউ হতে পারে।...গুড়ের নাগরি আমি কখনও চোখেও দেখিনি।'

'ফের আবার সাফাই গাওয়া! ড্যাকরা কোথাকার! ডাকব নাকি পাড়ার লোকদের? অ্যাঁ? ডেকে জড়ো করব সবাইকে? পচার মা বলছিল মিনসেটার গোঁপটোঁফ নেইকো—কিন্তু এখন তো দেখছি দিব্যি গোঁফ। শখ করে রাতারাতি গোঁফ গজানো হয়েছে! ভোল পালটে এসেছ—বাপু! ভাবছ কেউ ঠাওর পাবে না। দেখে দেখে তিনকাল গেল—চোখে ছানি পড়ল আমার! আমার কাছে রাহাজানি? ঠক কোথাকার! দেখি তো গোঁফজোড়াটা ঝুটো না আসল। টেনে ছিঁড়ে নিয়ে দিইগে পচার মাকে! দুঃখু ঘোচাই ওর।'

এই বলে মেয়েটি মাথার মোট অবলীলায় মাটিতে নামিয়ে, আরও বেশি অবলীলাক্রমে স্বহস্তে সবেগে হর্ষবর্ধনের গোঁফের দিকে এগোয়।

।। এগারো ।।

গোঁফ বেহাত হবার উদ্যোগেই হর্ষবর্ধন সাত হাত পিছিয়ে গেছেন।

কুসংস্কার বলো আর যাই বল, হর্ষবর্ধনের ধারণা গোঁফ তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি—একমাত্র তাঁরই হাতাবার, অপর কারও তাতে হস্তক্ষেপের অধিকার নেই। সেখানে অন্য কারও একতিয়ার নাস্তি!

তিনি আর এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়ান না। কোথায় পরের বোঝার গুরুভার বহন করবেন না তাঁর নিজেরই গুম্ফভার লাঘব হবার যোগাড়!

উল্টো উৎপত্তি আর কাকে বলে!

বিপদ আপন্ন হলে পণ্ডিতরা যেমন সম্পদের অর্ধেক ত্যাগ করতে দ্বিধা করেন না, হর্ষবর্ধনও তেমনি এ-হেন গোলযোগে, না, তাঁর গোঁফের আধখানা নয়, কর্তব্যের গুরুভার পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র গুমফভার নিয়েই সরে পড়েন।

নাঃ। আর পরোপকার নয়। পরোপকারের আশা দুরাশা মাত্র। সে-আশায় জলাঞ্জলি দিতে হল। মেয়েটি উদ্যত হাত নিয়ে এগিয়ে আসছে, সেও বুঝি হর্ষবর্ধনের গোঁফ হাতছাড়া করতে নারাজ। হর্ষবর্ধন পলায়নপর হন।

ঊর্ধ্বশ্বাস বেগে একেবারে পোয়াঢাক মাহল দূরে গিয়ে তিনি হাঁফ ছাড়েন।

কাঞ্চনও সেই ছেলেটিকে তাড়িয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরছিল সেই সময়।

দু-জনে মুখোমুখি। গভীর দুঃখে দুঃখী।

'কী ব্যাপার মশাই?' কাঞ্চন শুধায়, হাঁপাচ্ছেন যে!'

হর্ষবর্ধন পিছু ফিরে সেই মেয়েটি তাড়া করে আসছে কি না ভালো করে তাকিয়ে নিয়ে বলেন—যদ্দূর খারাপ হতে হয়।'

'কী হয়েছেটা কী?'

'সেই মেয়েটা! তাড়া করে আসছে আমাকে।'

'সেই বেগুনিখোর ছেলেটার মা বুঝি? খুব রাগ করেছে আপনার ওপর?'

'না, তার মা নয়, হয়তো, তার পিসীমা হতে পারে। প্রায় পিষে ফেলেছিল আমায় আর কি!'

'অ্যাঁ? বলেন কি মশাই?'

'তুমিই বলো না! পরের গোঁফে কি হাত দেওয়া যায়? কেউ দেয় কখনও? উচিত কি সেটা?'

'কখনই না। গোঁফ তো পরের দ্রব্য, মানে পরের গোঁফ পরের জিনিস, নিজের গোঁফ নিজের'—বলে সে নিজের গোঁফে হাত দেয় যেখানে তখনও কোনও গোঁফ বেরয় নি—তা, না বেরুলেও এ-সম্বন্ধে তার মতামত দ্ব্যর্থহীন ঃ 'পরের গোঁফে হাত না বাড়িয়ে বরঞ্চ নিজের গোঁফ বাড়িয়ে নেওয়া ভালো। পরের দাড়ি-ক্ষেত্রে চষতে না গিয়ে নিজের দাড়ি আবাদ করাই উচিত।'

'আমিও তো সেই কথাই বলি। কিন্তু মেয়েটা আমার গোঁফ উপড়ে নিতে চায়—সেই হেতুই হাত বাড়িয়েছিল।' হর্ষবর্ধন বিরক্তি প্রকাশ করেন—'কেন নিজের গোঁফে হাত দিক না বাবা!'

'অ্যাঁ?' শুনেই চমকে ওঠে কাঞ্চন—'সেকি! সেই মেয়েটার নিজের গোঁফ আছে নাকি?'

'না, নেই। মেয়েদের কি গোঁফ থাকে নাকি? তা নাই থাকল, তাই বলে কি পরের গোঁফ উপড়ে নিতে হবে। এ-রকম উপরি পাওনার লোভ করা তো ভালো নয়।

'নয়ই তো।' কাঞ্চন সায় দেয় তাঁর কথায়—'তাছাড়া, গোঁফে আপনার পরিচয়—গোঁফ গেলে আপনার রইল কী আর?'

'তাই বলো। আহা, আমিও তো সেই কথাই বলি।'

'আপনি কেন, কবি সুকুমার রায়ও সেই কথা বলেছেন। তাঁর আবোল-তাবোল পড়েছেন? তিনি বলতেন, 'গোঁফকে বলে তোমার আমার, গোঁফ কি কারও কেনা? গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, গোঁফ দিয়ে যায় চেনা।'

'মোটেই আবোল-তাবোল নয়, খাঁটি কথা।...গোঁফ হচ্ছে জীবনের সবচেয়ে মহার্ঘ বস্তু—ডীয়ারনেস

অ্যালউএনস্। টাকাকড়ির চেয়েও দামি। টাকাকড়ি রোজগার করা যায়, খরচ করা যায় ইচ্ছে মতন—গোঁফ কিন্তু তা যায় না। গোঁফ অমূল্য ধন।' তিনি বলেন—'এ হেন ধন কি বললেই পরের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায়।'

'কক্ষনও না। কোনও ধনই যায় না। বাবা বলেন, 'পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনম্। কার্যকালেঝুপস্থিতে না সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্।' কাঞ্চন বলে ঃ 'মানে যে বিদ্যা বইয়ের মধ্যেই রইল আয়ত্ত হল না আর যে টাকা পরের কাছে গচ্ছিত আছে—কার্যকালে তার কোনই দাম নেই।'

'খনার বচন?'

'খনার বচন কি না জানিনে তবে ক্ষণে ক্ষণে আওড়াতেন বাবা।' সে বলে ঃ 'আমাদের শিক্ষাদানের জন্যেই, বুঝেছেন?'

'কিন্তু ওই ঝুপস্থিতের মানেটা কি?'

'ঝুপস্থিতে, মানে সমসকৃতের ওই রকম উচ্চারণ। ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলেন বাবা, কার্যকালে হি উপস্থিতে—সন্ধি করে হয়ে যায় ঝুপস্থিতে। বুঝেছেন এবার।'

'বুঝেছি।' ঘাড় নাড়েন হর্ষবর্ধন ঃ 'কার্যকালগুলো প্রায়ই ঝুপ করে এসে হাজির হয় কিনা! সেই জন্যেই ঝুপস্থিতে বলেছে। খপস্থিতেও বলা যেত। মেয়েটা যেমন খপ করে আমার গোঁফে হাত দিতে এসেছিল....যা করে দৌড়ে পালিয়ে এসেছি....বাপ!'

'মেয়েটাকে বাবার আরেকটা শ্লোক ছুড়ে মারলেন না কেন? বলতে পারতেন, 'মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ....'

'মানে?' হর্ষবর্ধন বাধা দিয়ে জানতে চান।

'মানে, তুমি হচ্ছ পরের বউ আমার মার মতন, এভাবে কি তোমার রাস্তায় বেরুনো উচিত, পর্দার আড়ালে পর্দানশীন হয়ে থাকাটাই তোমার পক্ষে ভালো...।'

'নিশ্চয় নিশ্চয়! এই খাণ্ডারখর্পরধারিণীরা কেন যে পথে বেরয়।'

'আর আমার গোঁফ তোমার কাছে পরদ্রব্য...এটাকে সামান্য ঢেলার মতোই জ্ঞান করা উচিত তোমার...' সে শুধায় ঃ 'শ্লোকটা আপনি জানতেন না নাকি?'

'কি করে জানব? তোমার বাবার শ্লোক আমি জানব কি করে? তোমার বাবা কি আমায় বলেছেন কোনওদিন? চোখেই দেখিনি তোমার বাবাকে।'

'যাক তার জন্যে মনে কোনও ক্ষোভ রাখবেন না। আপনার বাবাকেও তো আমি দেখিনি। শোধবোধ হয়ে গেল আমাদের।'

'পরোপকার করা ভারী কঠিন কাজ, বুঝলে হে কাঞ্চন? মোটেই করা যায় না—কিছুতেই নয়।'

'কে বললে? তার জন্যে সবুর করতে হয়। সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হয়। সবুরে মেওয়া ফলে বাবা বলেন।'

'কই আর ফলছে!' দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে হর্ষবর্ধনের।

'কেন, ফলল না কি? আমার বেলায় তো ফলেছে। আমি যেমন অপেক্ষা করেছিলাম আপনার ট্রাম থেকে নামার। আগে এগিয়ে গেলাম। এগুতে পারলাম তখন।' সে উদাহরণ দেয় ঃ 'বলুন, সেটা কি একটা পরোপকার করা হয়নি আমার?'

'তা বটে।' মানতে হয় হর্ষবর্ধনকে—'কিন্তু আমার বরাতটাই খারাপ! এমন সুযোগ আমার জীবনে কখনও আসেনি। কখনও আসে না। আমি একবার এক ছোট্ট খুকির মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলাম। উপকারটুপকার কিছু করার কুমতলবে নয়। এমনিই বুলিয়েছিলাম...কিন্তু তার মা এমন করে তেড়ে এল যে পাড়া ছেড়ে পালিয়ে বাঁচি!'

'আপনাকে ছেলেধরা ভেবেছিল বোধহয়।'

'কিন্তু ছেলে তো ছিল না, মেয়েই তো! ছেলেধরারা কি মেয়ে ধরে নাকি? তা নয়। আমার এই পোড়া বরাতই তার জন্য দায়ি। আরেকবার আরেকটি মেয়ের বেলায় কী হয়েছিল বলি শোনো, সে নেহাত কচি খুকি না। ইস্কুলে পড়া মেয়ে, ক্লাস নাইন-টেনের হবে বোধহয়। স্কুলের বাস-এ উঠতে যাচ্ছিল, পারছিল না।'

'পারছিল না কেন?' সে শুধায় ঃ 'দাঁড়াচ্ছিল না বাস?'

'এক হাতে বই-খাতা আরেক হাতে শাড়ির আঁচল—কোনটা সামলায়? বাসের হ্যান্ডেল ধরে উঠতে হবে

তো? হ্যান্ডেল ধরবে কোন হাতে, উঠবে কি করে? আমি তার অসুবিধা দেখে তাকে ধরে তুলে দিতে গেলাম, মেয়েটা করল কি, ঠাস করে আমাকে এক চাপড় মেরেই তিড়িং করে উঠে পড়ল বাসে।'

'আশ্চর্য তো! উঠতে পারছিল না অথচ!' কাঞ্চন হতবাক হয়—'একেবারে লাফিয়ে উঠল?'

'সেটা এমন কিছু আশ্চর্য নয়। তার এক হাতে বই-খাতা অন্য হাতে শাড়ির আঁচল, সে কোন হাতে আমাকে চড়টা মারল তাই ভেবে আমি অবাক হয়েছি ভাই; তার তো তৃতীয় কোনও হাত ছিল না।'

'মেয়েরা সব পারে। সূর্পনখাদের অসাধ্য কিছু নেই।' কাঞ্চন বলে।—'বামনদেবের হঠাৎ যেমন এক তৃতীয় পা বেরোয় তেমনি মেয়েরাও এক হাত দেখিয়ে দিতে পারে—ইচ্ছে করলে!'

'যা বলেছ ভাই! মেয়েরা সব পারে। ভারী বোঝার ভার তাদের সয়, কিন্তু পরে এসে যেচে উপকার করলে তার তর সয় না। যেমন মোট বইতে পারে তেমনি মোটা হতেও পারে—তাদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব না। কিন্তু সে কথা না, আমি বলছিলাম যে পরোপকার করব কি, আমার এই পোড়া বরাতে তা হবার জো নেই।'

'অনেক তোড়জোড় করেই পরের উপকার করতে হয় তা জানেন?'

'কেমন?'

'একটা ডুবন্ত লোককে সলিলসমাধি থেকে উদ্ধার করাটা একটা দারুণ পরোপকার, আপনি মানেন তো?'

'আলবাত।' তিনি মেনে নেন ঃ 'কিন্তু হাবুডুবু লোক পাচ্ছি কই আমি? কোথায় পাচ্ছি?'

'তার জন্য তোড়জোড় করা দরকার। প্রথম সেই লোকটাকে নদী কি পুকুরের ধারেকাছে পেতে হবে, কিংবা ধরে-বেঁধে কি ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে যেতে হবে, তারপরে তাকে ধাক্কা মেরে জলের মধ্যে ফেলে দিতে হবে। তারপরেই না আপনি জল থেকে উদ্ধার করে প্রাণ বাঁচাতে পারবেন তার!'

'না, সেটি আমার দ্বারা হবার নয়।'

'কেন, কেন হবে না? পারবেন না কেন? একটা লোককে জলে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া কি খুব শক্ত কাজ?'

'না তা নয়। এমন কি সে নিজগুণেও জলে পড়ে যেতে পারে, কিন্তু তাহলেও তাকে উদ্ধার করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আমি নিজেই সাঁতার জানি না যে।'

'তাহলে তাকে আগুনের হাত থেকে বাঁচান। জ্বলন্ত বাড়ির তেতলার ঘর থেকে একটা লোককে নামিয়ে নিয়ে আসুন সটান।'

'তার জন্যে কী করতে হয়?' কৌতূহলী হন হর্ষবর্ধন।

'আগে থেকে একটা লম্বা মই এনে খাড়া করে রাখতে হয় বাড়ির গায়। তারপর আর কি, আগুন লাগিয়ে দেবেন সেই বাড়িতে।'

'আগুন লাগিয়ে দেব? লোকে দেখতে পায় যদি?'

'আড়াল-আবডাল থেকে লাগাবেন তো! কিন্তু সাবধান, আগুন লাগাবার আগে মইটই সব হাতের কাছে মজুদ রাখবেন যেন।'

'রাখলেই বা কী! মইয়ে হাত দেওয়া দূরে থাক, পা ঠেকাতেও আমি পারব না। মই অমনি মড়মড় করে ভেঙে পড়বে। সামান্য মই আমার পদভার সইতে পারবে না!'

'তাহলে আর কী হবে!' কাঞ্চন হাল ছেড়ে দেয়—'কী করে কী হবে তাহলে!'

'কিচ্ছু হবে না। সেই কথাই আমি বলছি তো হে! আমি দারুণ অপয়া, আমার পোড়া কপালে কিচ্ছু হয় না—এক টাকাকড়ি ছাড়া আর কিছুই হয় না এই বরাতে—বরাবর দেখে আসছি এই।' বলতে বলতে হঠাৎ তিনি উসকে ওঠেন ঃ 'দেখো কী সুন্দর ছেলেটা!'

একটা বাচ্চা ছেলে পথের ধারে বসানো রয়েছে তাঁরা দেখতে পান। ফুটফুটে শিশু।

'একটু আদর করব ছেলেটাকে? ভারী ইচ্ছে করছে কিন্তু।'

'দেখুন ওর মা-টা কেউ কাছে-পিঠে আছে কি না।' কাঞ্চন সতর্ক করে।—'আমাদের ধরে পিটে না দেয় আবার!'

'না, কেউ কোথাও নেই।' চারধার তাকিয়ে দেখে তিনি বললেন—'একে এখানে একলাটি ফেলে রেখে গেল কোথায়!'

'ছেলেটা হারিয়ে যায়নি তো!'

'কার ছেলে কে জানে! খোঁজ নিতে হয়।' হর্ষবর্ধনের পরোপকারস্পৃহা প্রাণে আবার পুরাতন প্রবণতা চাগাড় দেয়।

'দেখুন, একটা ষাঁড় আসছে ওদিকে থেকে।'

'ছেলেটাকে লক্ষ করেই আসছে দেখছো? গুঁতোতেই আসছে এদিকে নির্ঘাত।'

'না না! গুঁতোতে নয়, ছেলেটার সঙ্গে ভাব জমাতে আসছে বোধহয়—ছেলেটা ষাঁড়টাকে হাত নেড়ে নেড়ে ডাকছে দেখছেন না?'

বাস্তবিক তাই। ছেলেটা গৌ গৌ বলে ষাঁড়টার দিকেই হাত বাড়িয়েছে বটে। হর্ষবর্ধনের দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। ষাঁড়কেই লক্ষ।

হর্ষবর্ধন ছেলেটির এই উপেক্ষায় মর্মাহত হন, অপমানিত বোধ করেন। তিনি অমন হোমরাচোমরা মানুষ, তাঁর দিকে দৃষ্টিই দিলে না—যত নজর কিনা ওই ষাঁড়ের দিকে। আর এই ছেলেকেই তিনি ষাঁড়ের শিংয়ের থেকে বাঁচাতে যাচ্ছিলেন!

'ধুত্তোর! যাকগে হতভাগা গুঁতোর মুখে খরচ হয়ে। চলো আমরা চলে যাই এখেন থেকে।' হর্ষবর্ধন কাঞ্চনকে নিয়ে এগিয়ে যান।

কিন্তু একটু যেতেই বিবেক তাঁকে দংশন করে, তিনি লাফিয়ে ওঠেন।—না, কাজটা ঠিক হল না ভাই! অবোধ শিশু, ওকি ভালোমন্দ কিছু বোঝে? ষাঁড়বস্তু কী, আর জীবনের সারবস্তু কী, তার কি কোনও জ্ঞান-গম্যি আছে তার? অমন করে ওকে গুঁতোর মুখে ফেলে আসাটা ঠিক হল না।'

ফিরে এলেন আবার তাঁরা অকুস্থলে।

এসে দেখলেন, শিশু তেমনি গৌ গৌ করে আলাপ করছে আর ষাঁড়টা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে সায় দিচ্ছে তার কথায়। দুজনেই বেশ কাছাকাছি, মুখোমুখিই প্রায়। কিন্তু গুঁতোগুঁতির কোনও লক্ষণ নেই।

'হারানো ছেলেকে নিয়ে কী করতে হয়?' জিজ্ঞেস করলেন হর্ষবর্ধন, 'তোমাদের বয়স্কাউটের কানুনে কী বলে?'

'থানায় জমা দিয়ে আসাটাই দস্তুর। তারাই যার জিনিস তাকে খুঁজে বার করে পৌঁছে দেবে।'

'চলো তাহলে থানায়।' হর্ষবর্ধন ছেলেটিকে নিজের ঘাড়ে তুলে নেন—'ফাঁড়িটা কোন দিকে জেনে দেওয়া যাক কারও কাছে।'

আড়াই জনে মিলে চলেছেন। একটা ডোবা, আটচালার এক পাঠশালা, পাড়াগাঁর বাজারটা পার হয়েছেন, এর মধ্যে থানাটা কোন দিকে জেনে নিয়েছেন একজনার থেকে—তারপর হেলে-দুলে চলেছেন সহর্ষে।

এমন সময় পিছনের দিক থেকে এক হই-হই রই-রই আওয়াজ ছুটে আসে।

একদল লোক মার মার রবে দৌড়ে আসছে চারধার থেকে। লাঠিসোঁটা কাস্তেকুড়োল কঞ্চিবাঁখারি, যে যা পেয়েছে হাতের কাছে তাই নিয়ে সোরগোল তুলে তেড়ে আসেছ। তোড়ের মতোই।

হর্ষবর্ধন বারেক দৃকপাত করেন—'ও কিছু না- পাড়াগাঁর ব্যাপার। সব গাঁয়েই লেগে থাকে; মাঝে মাঝেই লাগে ও-রকম। ওদের নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকাণ্ড—ভাত হজম করার উপায়। মারামারি—মামলা ফামলা—না করলে ওদের খিদে পায় না, ঘুম হয় না।'

'ওদের ঝগড়ায় আমাদের কি!' কাঞ্চন বলে।

'ওদের ব্যাপারে আমরা কেন নাক গলাতে যাব। কোনও দলেই আমরা যোগ দেব না—কারও কোঁদলেই না।'

কিন্তু কাঞ্চনের যেন কেমনতর ঠেকে—'পালিয়ে গেলে হয় না? এখান থেকে এক দৌড়ে যে কোনও দিকে?'

'কেন, পালাব কেন? নিজেদের মাথা ফাটাক না ওরা, আমাদের কি! আমাদের গায়ে না আঁচড় লাগলেই হল।'

'এখানকার লোকের আচরণ কেমন ধারা কে জানে—নখ-টোখ কাটে কিনা তাও জানি না!'

'ভয় কি আমাদের? আমরা তো এদের কোনও উপকার করিনি। কারও না, কক্ষনও নয়। এদের কাউকে চিনি না পর্যন্ত!'

ততক্ষণে সেই ধাবমান বাহিনী তাঁদের সামনে এসে পড়ে।

'ওই যে ওই! ওই সেই লোকটা!'

দলের মধ্যে সবচেয়ে যে আগুয়ান, সবার চেয়ে তেজীয়ান, ভয়ঙ্কর চেহারার সেই লোকটি হর্ষবর্ধনের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

হর্ষবর্ধনের বুকের ভেতরে যেন হাতুড়ি পেটে।

হর্ষবর্ধনকে ওরা চারধার থেকে ঘিরে ফেলে—'ছেলেধরা! ছেলেধরা! ধরা পড়েছে। পাকড়েছি।' বলে সবাই মিলে চেঁচাতে থাকে তারা। দারুণ হট্টগোল।

ভয়ঙ্কর চেহারার লোকটা এগিয়ে এসে তাঁর হাত পাকড়ায় আর বদখৎ চেহারার আরেক জনকে হুকুম করে ঃ 'দেখ তো ভূতো, তল্লাস করে দেখ তো, বেটার কোমরেটোমরে কোথাও ছোরাটোরা লুকোনো আছ কিনা।'

'না, কোমরে কিছু নেই। তবে পাশে একটা ছোঁড়া রয়েছে দেখছি—' কাঞ্চনকে সে দেখায়—'এটাকেও ধরে এনেছে কি না কে জানে!'

'আমাকে কেন ধরে আনবেন? আমি কি কচি খোকা?' কাঞ্চন আপত্তি করে ঃ 'আমি তো আপনার থেকে ওঁর সঙ্গে যাচ্ছি।' বলে আরও সে যোগ করে,—'কিংবা আমিই ওঁকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি বলা যায়। এই পথে ওকে ধরে নিয়ে এসেছি আমিই।'

।। বারো ।।

'কে ছেলেটা? একে তো আমরা চিনিনে।' বলল একজন।

'কোথাকার ছেলে! এ গাঁয়ের তো নয় বোধ হচ্ছে।'

'ওকে আমি এই লোকটার সঙ্গে আসতে দেখেছি বাজারের পাশ দিয়ে আজ।' জানালো একজনা ঃ 'ওই লোকটার শাকরেদটাকরেদ হবে বোধহয়।'

'আমি কারও সাকরেদ নই।' কাঞ্চন প্রতিবাদ করে ঃ 'কারও শাকরেদ হবার জন্যে আমি জন্মাই নি। আমি হচ্ছি আমি।'

তার আমিত্বের আস্ফালনে কেউ কর্ণপাত করে না।

'এদের দুজনকে আমি পাশাপাশি আসতে দেখেছি। বাজারের মাঠে খোকা খেলা করছিল, আমি স্পষ্ট দেখলাম, ওই ছেলেধরাটা একবার চারপাশে বেশ ভালো করে তাকিয়ে দেখল, তারপরে কেউ কোথাও নেই দেখে টপ করে ছেলেটাকে কাঁধে করে তুলে নিল। স্পষ্ট আমি দেখলাম।'

'ছেলেধরা না হয়ে যায় না। বদমাইশ লোক আলবাত।'

'না, আমি ছেলেধরা নই। কক্ষনও না।' এবার হর্ষবর্ধন প্রতিবাদে সোচ্চার হন।—'কেউ এ-কথা বলতে পারে না। আপনি আমার ঘাড় ছেড়ে দিন। লাগছে।'

যে হোঁৎকা লোকটা এতক্ষণ হর্ষবর্ধনের ঘাড় পাকড়ে ধরে ছিল সে তাঁর ঘাড়ে বেশ কয়েক ঘা লাগিয়ে দেয়। —'এখন কেমন লাগছে?'

তারপরে আবার সে তাঁর স্কন্ধ মর্দন শুরু করে।

'ঘাড় ছাড়ুন! ঘাড় ছাড়ুন! মারা গেলাম!'

'ঘাড় ছাড়ব? মাইরি! মামার বাড়ির আবদার? ছেলে নিয়ে পালাচ্ছিলে কেন?'

'পালাইনি তো। ফাঁড়িতে জমা দিতে নিয়ে যাচ্ছিলাম।' তিনি জানান।

সঙ্গে সঙ্গে উতোর গাইল একজন—'মরে যাই! মরে যাই!!'

'ফাঁড়িতে জমা দিতে নিয়ে যাচ্ছিলে! মাইরি আর কি?' ভয়ঙ্কর চেহারা ঠাস করে তাঁর গালে এক চড় বসিয়ে দেয়—'ছেলেধরা বদমাইশ।'

ফাঁড়ি দেখেছ! ফাঁড়া দেখনি তো!' জাপটে-ধরা লোকটিও কসুর করে না। পেছন থেকে সাপটে ধরে হর্ষবর্ধনকে হাঁটুর গুঁতো লাগাতে থাকে!

'এবার দেখো তাহলে।' আরেকজনা ঘাড়ে রদ্দা মারে।

'আরও দেখো আবার!' অপর একজন তাঁর পেটে ওরফে ভুঁড়িতে এক কোঁৎকা ঝাড়ে।

জনতার ভেতর ভয়ানক উত্তেজনা পড়ে যায়। যে পারে কাছিয়ে আসে, ওঁর কাছা ধরে টানে, খুশিমতো কিল-চড়-ঘুসি বসায়। ছোটো ছোটো ছেলেরা, যাদের ছেলেধরার ভারী ভয়, আগাতে সাহস পায় না, দূর থেকেই ঢিল পাটকেল লাগায়। আরও যারা ছোটো, তারা আরও দূর থেকেই দাঁড়িয়ে ভেংচি কাটে।

ভয়ঙ্কর চেহারার লোকটি বসন্তলাঞ্ছিত এক ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করে—'দে তো ঘোঁতনা তোর কাস্তেটা। দিই ব্যাটার একটা কান কেটে। এক কানকাটা হলে সে গাঁয়ের বার দিয়ে যাবে। এ গাঁয়ে ঢুকবে না আর।'

'না না, কান কেটো না! দোহাই! একটা কান গেলে আমার থাকবে কী!' বলেই তিনি নিজের ভ্রম সংশোধন করেন ঃ 'আরেকটা কান থাকবে বটে। কিন্তু দুটো কানই চাই আমি। দুটোরই আমার দরকার।'

'তাহলে ওর এক ধারের গোঁফ ছেঁটে দেওয়া যাক!'

ঘোঁতনা কাস্তে আগিয়ে দিতে এসে বলে ঃ 'সেই ভালো বরং! শিকারী বেড়ালের গোঁফ দেখলেই চেনা যায়। বুঝেছ দাদা?'

ভয়ঙ্কর চেহারা এবার কাস্তেটা বাগিয়ে ধরে ঃ 'দিচ্ছি ব্যাটার শিকারের ব্যায়রাম সারিয়ে।'

সকলের জড়াজড়িতে জর্জর, চারধার থেকে জড়ীভূত হর্ষবর্ধন এতক্ষণ যদিও বা স্থির ছিলেন, কাস্তেটা গোঁফের কাছাকাছি আসতেই চঞ্চল হয়ে ওঠেন—'তোমাদের পায়ে পড়ি, তোমরা আমাকে প্রাণে মারো, কিন্তু আমার গোঁফে হাত দিয়ো না। আমায় গোঁফে মেরো না। ওই কাস্তের ঘা দেহের সর্ব জায়গায় সইতে রাজি আছি, গোঁফকে আমার ঘায়েল করো না কেবল। আমি প্রাণ দেব কিন্তু গোঁফ দিতে পারব না। দোহাই তোমাদের— পায় পড়ি দাদারা!'

ভূতোর মনে কিঞ্চিৎ সহানুভূতি জাগে ঃ 'থাকগে দাদা, গোঁফ ছেঁটেকাজ নেই ওর। ছেড়ে দাও তাহলে। বলছে যখন অত করে'—সে সদয় হয়—'তার চেয়ে হাত পা বেঁধে ওকে ওই কূপের মধ্যে ফেলে দেওয়া যাক বরং।'

ভূতোর অভূতপূর্ব ব্যবস্থা। পাশে ইঁদারার দিকে সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সকলেই এই কথায় এক বাক্যে সর্বান্তঃকরণ সম্মতি জ্ঞাপন করে। উন্মত্ত জনতা তখন দারুণ দুর্জনতা হয়ে দাঁড়িয়েছে—'সেই ভালো! ব্যাটা পাতকোর মধ্যে পপাত হোক!'

'সেই ভালো! সায় দেয় সবাই ঃ 'পাতকোর মধ্যে কাত হয়ে থাক। নিপাত যাক।'

হর্ষবর্ধনকে, তাঁরই স্ববস্ত্রে—মাছের তেলে মাছ ভাজার মতোই—ভালো করে বাঁধাছাঁদা হচ্ছে। এই সময়ে আর একটা হট্টগোল ওঠে ঃ 'পালাও! পালাও! ষাঁড় ক্ষেপেছে! পাগলা ষাঁড়!!'

অমনি ঝড়ের মুখে ছাতা যেমন ভেঙেচুরে উলটে যায়, ঝরা পাতারা ওড়ে যেমন—তাবৎ লোক চক্ষের পলকে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

হর্ষবর্ধন একলা পড়ে থাকেন ধরাশয্যায় বন্দী দশায়।

বদ্‌খৎ লোকটা যাবার আগে বলে যায় ঃ 'থাক ব্যাটা বাঁধা পড়ে এখানে। ইঁদারার হাত থকে বেঁচে গেলি বটে, চুবুনির বদলে গুঁতুনি খা এখন। ওই ষাঁড়েই তোকে সারবে।'

আসন্ন ষাঁড়ের দিকে সভয় নেত্রে তাকিয়ে তিনি স্বগতোক্তি করেন ঃ 'বুঝেছি কেন তুমি তেড়ে আসছ। আমাকে গুঁতোবার জন্যেই। আমাকে তুমি হাড়ে হাড়ে শিক্ষা দিতে চাও। সবারই আমি উপকার করতে চেয়েছিলাম। তার ফলে আমার এই দশা। যদি অপকার কারও করে থাকি তো, সে তোমার। কেবল তোমারই আমি যা ক্ষতি করেছি। ছেলেটাকে তোমায় গুঁতোতে দিইনি, সে জন্যে আমি অনুতপ্ত। কিন্তু তোমাকে অনুরোধ করা বৃথা। হাত পা বাঁধা আমার, উত্থানশক্তিরহিত আমি, পালাবার আমার খ্যামতা নেই। কূপে কাত হইনি বটে, কিন্তু কুপোকাত হয়ে রয়েছি। দেখ, এই তোমার সুযোগ। আমি পালাতে পারব না। যদি আমায় গুঁতোতে চাও তো গুঁতিয়ে নাও। গুঁতিয়ে দাও। মনের সুখে প্রাণ ভরে গুঁতাও।'

ষাঁড় কিন্তু হর্ষবর্ধনের কথায় কর্ণপাত করে না, ভ্রূক্ষেপই করে না তাঁর দিকে। যেমন ছুটতে ছুটতে আসে তেমনি ছুটতে ছুটতে চলে যায়—সেই দুর্জনতার পিছু পিছু ধাওয়া করে।

ষাঁড়টা চলে গেলে পর হর্ষবর্ধন ঘাড় ফিরিয়ে চারধারে তাকান, কাঞ্চনটা গেল কোথায়? লোকগুলো কি তাকেই পাকড়ে নিয়ে গেল নাকি?

ষাঁড়ের তাড়ায় উধাও লোকদের সঙ্গে কাঞ্চনও তিনটে পাড়া ছাড়িয়ে গেছল।

হর্ষবর্ধনের ইতিমধ্যে কী দশা হয়েছে ভাবতে ভাবতে আসছিল সে। ফিরে এসে হয়তো তাঁর ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাবে। প্রাণটা ধুঁকছে বুঝি কেবল। স্কাউটের কর্তব্য-পালনের মোক্ষম সুযোগ তার তরে অপেক্ষমান। তর সইছিল না তার। কিন্তু ভাবনাও ছিল বইকি! কর্তব্যের এই গুরুভার একলা কি সে বহন করতে পারবে? হর্ষবর্ধনের ভারি লাশ ঘাড়ে করে কাছাকাছি ডাক্তারখানায় নিয়ে যেতে পারবে কি?

কিন্তু ফিরে হর্ষবর্ধনকে অটুট দেখে সে খুশিই হয় বরং। 'আপনি বহাল-তবিয়তে আছেন দেখে বাঁচলাম। যা ভাবনা হয়েছিল!' সে হর্ষবর্ধনকে স্ববস্ত্রের বন্ধন থেকে বিমুক্ত করে।

হর্ষবর্ধন উঠে দাঁড়ান। কাপড় পরেন।

খাড়া হয়ে প্রথমেই তিনি নিজের পকেট হাতড়ান—না, তাঁর জামার পকেটে কেউ হাত গলায়নি। টাকাকড়ি হাতায়নি কেউ। নোটের গোছা ঠিক তেমনি রয়েছে।

'কাপড়টাই ছিঁড়েছে। জামায় কেউ হাত দেয়নি আমার।' তিনি জানান। কোটের পকেটে, পকেটের কোটরে, তাঁর নোটের তাড়া তেমনি মজুত তিনি দেখান।

ষাঁড়ের তাড়ায় যেমন কাহিল হয়েছিলেন নোটের তাড়ায় তেমনি এখন পুলকিত হন।

'দ্বাপর যুগের লীলাটা চলে গেল আপনার ওপর দিয়ে।' কাঞ্চন বলে ঃ 'কলিকালের চোট লাগেনি আপনার গায়।'

'তার মানে?'

'মানে, ওরা আপনার বস্ত্রহরণ করেছে কেবল, জামাই আদর করেনি।'

'জামাই আদরের কথা আসছে কোথ থেকে?'

'আপনার জামার গায় হাত দেয়নি ওরা। জামায় আদর করতে গেলেই হাতে হাতে তাদের পুরস্কার পেত। একেবারে নগদ।'

হর্ষবর্ধন বলেন, 'হুম্। খুব হল। বাড়ি ফেরা যাক এবার।'

বলে গুম হয়ে তিনি স্টেশনের পথ ধরেন। কাঞ্চন সঙ্গে সঙ্গে যায়।

একটু আগে যে-তিনি ছেলেটিকে ষাঁড়ের কবল থেকে উদ্ধার করে ঘাড়ে নিয়ে থানায় জমা দিতে যাবার সময় হাসিখুশির মলাট হয়ে হাঁটছিলেন সেই-তাঁর এখন অন্য চেহারা।

মুখভাব বদলে গেছে তাঁর। যে-মুখ নিয়ে আজ সকালে বাড়ির বার হয়েছিলেন সে-মুখ তাঁর নেই। যে-মুখে বিশ্বপ্রেমের ছাপ ছিল, ইতর ভদ্র সবার সঙ্গে ভাব করবার ব্যাকুলতা ছাপানো ছিল যে-মুখে—সবার প্রয়োজনে লাগবার, সকলের প্রিয়জন হয়ে উঠবার আকাঙক্ষা ছাপিয়ে উঠছিল যেখানে, সেখানে এখন সে-সবের কিছুই নেই—সে সব উপাদেয় ভাবের, সদ্ভাবের, একান্তই অভাব এখন সেখানে। তাঁর মধ্যে যা কিছু ভালো যা কিছু সারালো ছিল সে-সবের ধ্বংস হয়ে গেছে। মুখখানা কেমন এক রকম বিজাতীয় গোছের বানিয়ে যেন এক

ধ্বংসাবশিষ্ট হর্ষবর্ধন পথ হাঁটছেন এখন। 'কদাচ কাহারও উপকার করিব না—করা বাহুল্য মাত্র।' এই পৃথিবীর লোকচক্ষের উপর এই জাতীয় একটা বিজ্ঞাপন নিজের মুখপত্রে প্রকট করে তিনি চলেছেন যেন।

না, পরোপকার করাটা কিছু না! মারা গেলেও তিনি ও-কাজ করবেন না আর—ও-পথই মাড়াবেন না ইহজীবনে। এবং পরোপকার করাটা বিলাসিতা মাত্র—মারাত্মক বিলাসিতাই বলতে গেলে—মারধোর খেয়ে পরোপকারবিলাসী হতে তিনি বিলকুল নারাজ।

কেবল নারাজ নন, অসমর্থও বটে। না, পরের ভালো করে আবার কোন গাধা? এই সংসারে টিকে থাকতে হলে, ষাঁড়ের এবং অসারের হাত থেকে বেঁচে বহাল তবিয়তে বজায় থাকতে হলে হর্ষবর্ধন হাড়ে হাড়েই বুঝেছেন এখন, এক নাগাড়ে পরের অপকার করে যাওয়াই হচ্ছে প্রশস্ত পন্থা—আনন্দ-অর্জনের অনিন্দ্য উপায়।

অবিশ্যি ভেবে দেখলে পরের অপকার করাটাও কিছু কম কঠিন নয়। কি করে কোন কৌশলে যে পরের সর্বনাশ সাধন করা যায় হর্ষবর্ধনের তার কোনও ধারণাই নেই। কী করে যে পরের অহিত করবেন তিনি তার ঠাওর পান না। না, পরের ক্ষতি করবারও প্রতিভা থাকা চাই, বললেই সবাই তা পারে না, হর্ষবর্ধন খতিয়ে দেখেন। তাই মনে মনে তিনি ঘাড় নাড়েন—একান্তই যদি পরোপকার করতে অপারগ হন—নিতান্তই না পেরে উঠলে কী করবেন? সেক্ষেত্রে উপকারও না অপকারও নয়—এক রকম পরের অনুপকারী হতে তৎপর থাকাটাই শ্রেয় বোধহয়।

স্টেশানের পথ ধরে চলেন হর্ষবর্ধন। কাঞ্চন আনুষঙ্গিক, সেও চুপচাপ।

খুব পরোপকারের ধাক্কাটাই গেছে আজ সারাদিন। তার ধকলে সকল গায়ে ব্যথা। বাড়ি ফিরে বিছানায় গিয়ে গড়াতে পারলে, পাশবালিশকে জড়াতে পারলেই তিনি বাঁচেন। সাত দিন শুয়ে থাকলে যদি এই গায়ের ব্যথা যায়।

লাঞ্ছিত বিড়ম্বিত বিপর্যস্ত হর্ষবর্ধন আস্তে আস্তে চলেছেন—সূর্যও ঢলেছে আস্তাচলে।

টিকিট কেটে গাড়িতে উঠে বসেছেন দু-জনে।

'আজ কারও ভয়ঙ্কর একটা ক্ষতি করতে না পারলে আমি বাঁচব না।' ট্রেনের কামরায় বসে তিনি ফোঁস করে উঠেছেন হঠাৎ—'পরের অপকার করার জন্যে প্রাণটা আমার ছটফট করছে—কারও সর্বনাশ না করলেই নয় আমার।'

'এর নাম জিঘাংসা।' কাঞ্চন মন্তব্য করে—'জিঘাংসার তাড়নায় আপনি ভুগছেন।'

'কী ঘাংসা? কী বললে?'

'জিঘাংসা। তার মানে প্রতিশোধস্পৃহা। অর্থাৎ কিনা, হিংসা!'

'জীব হিংসা?'

'হ্যাঁ, কিন্তু কি করে তা করবেন?'

'তাই তো ভাবছি। কিছু ঠাওর পাচ্ছি না। কিন্তু এটা ঠিক—পরের কোনও অপকার না করতে পারলে আমি বাঁচব না।

'কেমন—কী ধরনের অপকার?'

'এমন কিছু করতে হবে যা ভালো নয়, ভালোর ঠিক উল্টোই; খুব খারাপ, খারাপের চরম—অন্যায়ের চূড়ান্ত একটা কিছু করতে হবে আমায়।' তিনি বাতলান ঃ 'তাহলেই আমার আজ সারাদিনের দেনা-পাওনা মিটে গিয়ে জমা খরচের খাতায় ডাইনে বাঁয়ে সমান হতে পারে। তাহলেই আমার দুঃখ মেটে, সব ক্ষতি পুষিয়ে যায়—সুখে আজ ঘুমুতে পারি বাড়ি গিয়ে।'

'কী করলে তা হয় ভেবে দেখেছেন?'

'ভাবছি তো তাই।'

'আমি বলি কি,' কাঞ্চন উসকে ওঠে, 'উপকার বা অপকার যাই বলুন, আগে আপন জনের ওপর দিয়ে—মানে, নিজের বাড়ির থেকেই শুরু করতে হয়। চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম, বলে না?'

'বলে তো! কিন্তু গোবরা করতে দিলে তো! ও উপকার অপকার কিছুই করতে দেবে না আমায়। কিছু করতে গেলেই পালিয়ে যাবে। এক নম্বরের বিচ্ছু! শয়তান। শয়তান।'

'তাহলে পাড়া-পড়শির থেকে...এমনি করে পাল্লা বাড়িয়ে ক্রমে ক্রমে সারা পৃথিবীর সবাইকে নিজের পাল্লায় ফেলা, সবার ক্ষতিসাধনের উপযুক্ত হওয়া—এ-ছাড়া তো আমি পথ দেখছি না।'

'দেখি, ভেবে দেখি।' হর্ষবর্ধন গুম হয়ে যান। অনেকক্ষণ তাঁর কোনও আর গুমরানি নেই! ভেবে ভেবে কাহিল হন।

ভাবতে ভাবতে মাঝেরহাট ইস্টিশান এসে পড়ে—গাড়ি থেকে তাঁরা নামেন।

রাত তখন বেশ হয়েছে। নিশুতি। রাস্তায় ট্রাম বাস ট্যাকসি কিচ্ছু নেই। হাঁটতে হাঁটতে চেতলার দিকে চলেন। কাঞ্চন পাশাপাশি!

'এইবার পেয়েছি।' বলে হঠাৎ হাঁকড়ে ওঠেন হর্ষবর্ধন।

'অ্যাঁ, কী বলছেন?' চমকে ওঠে কাঞ্চন।—'কী পেয়েছেন?'

'পরের ক্ষতি করার পথ। এই যে পাশেই পতিতুণ্ডীদের মুরগির আড়ত। এখান থেকেই আরম্ভ করা যাক না!'

'পতিতুণ্ডীরা তো সব ঘুমুচ্ছে এখন। কী ক্ষতি করবেন তাহলে?'

'ওর না হয় ওর মুরগিদের তো করা যায়। ওর মুরগিরা কিছু আমার আপনার নয়। পরই তো ওরা; তাছাড়া যার-পর নাই পাজি। সেদিন একটা যা তাড়া করেছিল আমায়! পতিতুণ্ডীর চেয়ে তারা কম বদ নয়। একটা ধেড়ে মুরগির কিংবা মোরগই হবে হয়তো, সেদিন এমন তেড়ে এসেছিল যে আরেকটু হলে খুঁচিয়েই দিত আমাকে। পালিয়ে পগার পার হয়ে বেঁচেছি...বলেছি না তোমায়?'

'মুরগিদের মেরে আর কী ক্ষতি পোষাবে আপনার? লাভই হবে বরং। সেই জবাই করা মরগি রেঁধে মজা করে খাওয়া যাবে বেশ। তার চেয়ে যদি পতিতুণ্ডীদের কাউকে খুন করতে পারেন...লোকহানি হলে তবেই না তাদের লোকসানি হয়।'

'উঁহু, তা হয় না। তাতে ফাঁসি হয়ে যায়—আমারই ফাঁসি হতে পারে। নিজেকে ফাঁসানোটা কি ঠিক? তাছাড়া তোমাকে সাক্ষী রেখে যদি খুন করি...স্কাউটরা সব সত্যবাদী, তাই না?'

কাঞ্চন কোনওটাই অস্বীকার করতে পারে না—খুন করে ফাঁসি হওয়া বা নিজের সত্যবাদিতা—কোনওটাতেই তার সংশয় নেই। অগত্যা সে চুপ করে থাকে।

'পতিতুণ্ডীর চেয়েও ওর মুরগিরা বেশি পাজি। রোজ সকালে আমাকে ঘুমুতে দেয় না, চেঁচামেচি করে আমার ঘুম ভাঙায়। আর রোজ ওই পতিতুণ্ডীকে টাটকা টাটকা ডিম পেড়ে দেয়—আর সে রোজ রোজ খাসা খাসা অমলেট খায়। আর পচা পচা ডিমগুলো সে বাজারে ছাড়ে....তার পাচার করা সেই পচাগুলো কিনে এনে বাড়িতে রেখে আরও পচিয়ে খেতে হয় আমাদের।'

'মুরগিরা কি পচা ডিমও পাড়ে নাকি?'

'অনেক অনেক পাড়ে। মানে, পাড়বার সময় টাটকাই থাকে, তবে অত অত ডিমের খাবে কত? বাধ্য হয়ে বাসি হয়ে কিছু কিছু পচেই যায় তো। বাসি বাসি সেই রাশি রাশি ডিম বাজারে আসে, আর.....'

'বুঝেছি। আর নগদ পয়সায় কিনে খেতে হয় আমাদের।'

'বেশ রাত হয়েছে, বুঝলে? পতিতুণ্ডীরা খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েছে সবাই। জেগে নেইকো কেউ। রাস্তাতেও লোকজন দেখছি না। এই সুযোগ।' বলে হর্ষবর্ধন মুরগিখামারের বেড়া টপকে মুরগিখানার ভেতরে গিয়ে পড়েন।

পড়েই মুরগিদের আটচালার আগল খুলে অন্দরে গিয়ে তিনি সেঁধিয়েছেন।

সেঁধিয়েই মুরগিদের খুপরিগুলো খুলে দিতেই তারা সব হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়েছে হই-হই স্রোতে।

ছেড়ে দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হন না, তেড়ে তেড়ে গিয়ে ধরেন এক একটাকে। আর ফুটবলের মতো শুট ঝেড়ে ঘরের বার বাগানের পার করে দেন। এলোপাথাড়ি লাথিয়ে চলেন সমানে। তাঁর মনে মায়া নেই মার্জনা নেই—মুরগিদের পিটিয়েই তিনি পতিতুণ্ডীদের ওপর—সবার ওপর গায়ের ঝাল ঝাড়েন। আজ এইখানেই, এখনই, তাঁর সব পাওনা মিটিয়ে নেবেন—যে-সব টাটকা ডিম তিনি খেতে পাননি, তার বদলে যে-সব পচা অমলেট তাঁকে গিলতে হয়েছে সে-সবের শোধ তুলবেন শ্রাদ্ধ করে সবার।

সেই লোকগুলোর মারধোরেরও প্রতিশোধ তুলবেন এই মুরগিদের ওপর দিয়েই। এমনি করেই নিজের গায়ের ব্যথা মারবেন আজকের।

তারপরে তিনি পা বাড়াবেন নিজের ঘরের দিকে। গা গড়াবেন বিছানায়। নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে পারবেন তাহলেই।

এইভাবে সাতাশ জোড়া মুরগিকে ধরে খুপরির বার করে এক এক শুটে বাগানের পার করে দিয়ে তারপরে নিশ্চিন্ত মনে সকাঞ্চন হর্ষবর্ধন বাড়ি ফিরলেন।

'কি রকম শুট এক একখানা দেখেছ আমার?' তিনি শুধান।

'দেখলাম তো।'

'গোষ্ঠ পালের মতোই। গোষ্ঠ পালের খেলা তুমি দেখেছ কখনও?'

'না, শুনেছি কেবল।'

'সেই গোষ্ঠলীলাই করলাম আমি আজকে। এইমাত্তর, বুঝলে?'

দুধের সাধ ঘোলে মেটানোর মতো হর্ষবর্ধন-পালায়, গোষ্ঠ পালের স্বাদ কতখানি সে পায় বোঝা যায় না কাঞ্চনের মুখ দেখে।

'আমি কি কোনওদিন ভাবতে পেরেছি যে এমন কাজ কোনওদিন করতে পারব? পতিতুণ্ডীদের এহেন ক্ষতি করতে পারব কোনওদিন? সেই অসাধ্যসাধন করে প্রমাণ করে দিলাম যে আমার প্রতিভা আছে। তুমি কি বলতে চাও আমার প্রতিভা নেই?'

'কে বলেছে?'

'না। কেউ অবশ্যি বলেনি, তবে আমার নিজেরই ওই রকমের একটা কুসংস্কার ছিল কিনা! সেই ভুল ধারণা আমার দূর হয়েছে এখন। হ্যাঁ, প্রতিভা আমার আছে, পরের ক্ষতি করার প্রতিভা। এইভাবে যদি আমি এগুতে পারি—প্রতি পদক্ষেপে ক্রমেই এগিয়ে যাই, ক্রমাগত চালিয়ে যেতে পারি এ-রকম পদে পদে, তাহলে চাইকি, একদিন আমি চেঙ্গিজ খাঁনের পর্যায়ভুক্ত হতে পারি। পারি না? তাহলে ইতিহাসে আমার নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে।'

'আর সেই ইতিহাস পড়ে পড়ে মুখস্থ করতে হবে আমাদের।' সায় দেয় কাঞ্চন।—'আর উত্তর দিতে না পেরে ফেল যেতে হবে আমাদের। পরের ক্ষতি করার প্রতিভা তখনও আপনার অটুট থাকবে।'

।। তেরো ।।

পতিতুণ্ডীয় মুরগিদের ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্ট করে কাঞ্চনকে নিয়ে ক্লান্ত দেহে হর্ষবর্ধন নিজের বিছানায় গিয়ে গড়িয়ে পড়লেন—তখন রাত গভীর।

কাঞ্চন তাঁর পাশের খাটে আশ্রয় পায়।

গোবর্ধন নিজের ঘরে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। হর্ষবর্ধন তাকে আর জাগালেন না। দরকারও ছিল না কোনও। ফেরার পথে এক পাঞ্জাবি-হোটেলে দু-জনেই গণ্ডেপিণ্ডে গিলে এসেছেন—খিদে ছিল না কারও-ই—ঘুমোতে পারলেই বাঁচেন এখন।

এক কাপ চা কি কফি কি কোকো বানিয়ে খেলে হত—ক্লান্তির কিছুটা দূর হত হয়তো—কিন্তু কে এখন ওই-সব হাঙ্গামা পোহায়?

বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘুম আসছিল না তাঁর—সারাদিনের যত ধকল মনের ভেতর সোরগোল পাকাচ্ছিল। বাবা! কী কাণ্ডটাই না গেল আজ দিনভোর! খানিক বাদে তিনি কাঞ্চনকে ডাকলেন—'ঘুমোলে নাকি হে কাঞ্চন?'

'না। ঘুম আসছে না!' সাড়া পাওয়া গেল তার।

'আমারও না। যেতে দাও ঘুমকে। আসবার হলে আপনিই আসবে বেটা।'

'আস্তে আস্তে আসবে।'

'কে বলে আমার প্রতিভা নেই?' খাপছাড়া তিনি জিজ্ঞেস করে বসেন হঠাৎ। খানিক আগেকার পুরনো কাসুন্দিই ভাজেন পুনরায়।

'কে বলেছে? আমি বলেছি সে-কথা?' কাঞ্চন বলে।

'না, তুমি বলনি। কেউই বলেনি। আমার নিজেরই ওই রকমের একটা সন্দেহ ছিল কি না। সেটা অবিশ্যি আমার কুসংস্কার—টের পাচ্ছি এখন।'

'তাই হবে।' সায় দিয়ে কাঞ্চন পাশ ফিরে শোয়।

'হ্যাঁ, আমার নিজেরই ভুল ধারণা ছিল যে আমার দ্বারা কখনও কারও অপকার হতে পারে না—পরের ক্ষতি করার কোনও সাধ্য নেই আমার। অপকার করবারও প্রতিভা থাকার দরকার—আর তা আমার একদম নেই। এই কথাই আমি ভেবেছিলাম এতদিন। কিন্তু সেই ভুল ধারণা আমার দূর হয়েছে। হ্যাঁ, আমিও পরের অপকার করতে পারি। সে কাজ আমার দ্বারা না হবার নয়। সে-প্রতিভা আছে আমার।'

'নিশ্চয় আছে।' নিদ্রাজড়িত স্বরে সায় দিয়ে যায় কাঞ্চন।

'নিজের চোখেই দেখলে তো, মুরগিদের কী রকমের অপকারটাই না করলুম আমি! সেই সঙ্গে পতিতুণ্ডীদেরও চরম ক্ষতি করা হল। তার মুরগিগুলো সব শেয়াল-কুকুরের পেটে গেল—আর তারা সকালে উঠে রোজ রোজ তাজা তাজা ডিমভাজা খেতে পাবে না। আ, কী আরাম! পরের অপকার করতে পারলে এমন বিমল আনন্দ হয় ভাই!'

'শুয়ে শুয়ে আবার নাচতে যাবেন না যেন!'

'শুয়ে শুয়ে আবার নাচা যায় নাকি? তোমার যেমন কথা! হর্ষবর্ধন হাসেন।

'কেন যাবে না? নাচতে নাচতে শুয়ে পড়া যায় যখন।'

'না। শুয়ে শুয়ে নাচা যায় না। হাত পা ছোড়া যায় অবিশ্যি।'

'নাচ তো আহা, তাই মশাই! তাছাড়া কী আর।'

'আনন্দে আমার হাত পা ছুড়তে ইচ্ছে করছে অবিশ্যি। কিন্তু মশারিটা ছিঁড়ে যাবে যে! মশারি ছিঁড়লেও ক্ষতি ছিল না, কিন্তু মশারা সেই ফাঁকে ঢুকে পড়বে না? চেতলার মশা বাবা! এক রাতেই আমার সব রক্ত শুষে নিয়ে আধখানা করে দেবে। না, আমি মশাদের এমন উপকার করতে চাই না। নিজের রক্ত দিয়ে মোটা করতে পারব না তাদের। সেটা তাদের যাচ্ছেতাই উপকার করা হবে। যৎপরোনাস্তি উপকার। না, কারওরই উপকার করব না আর জীবনে—এই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।'

কাঞ্চন কোনও সাড়া দিল না। ঘুমিয়ে পড়ল বুঝি।

'এত দিনে একটা কাজের মতো কাজ করেছি বটে! বুঝলে হে কাঞ্চন! এইভাবে করতে পারলে, চালিয়ে যেতে পারলে ক্রমাগত, বুঝলে কাঞ্চন? ক্রমশই নিজের প্রতিভায় প্রতিভাত হতে হতে, আশা করা যায়, একদিন আমি চেঙ্গিজ খাঁর সমপর্যায় উঠতে পারব। কী বল তুমি?'

কোনও জবাব নেই কাঞ্চনের।

'ইতিহাসে আমার নাম রেখে যাব। অমর হয়ে থেকে যাব। বুঝেছ?'

কাঞ্চন কোনও সাড়া দেয় না। সে বোধহয় তখন ভূগোলের সীমানা পার হয়ে গেছে।

বেশ বেলা করে ঘুম ভাঙল হর্ষবর্ধনের। ভাঙতেই হাঁক পাড়লেন কাঞ্চনকে—'ঘুম ভেঙেছে তোমার?'

'অনেকক্ষণ। একলা একলা উঠে কী করব। তাই শুয়ে রয়েছি চুপচাপ!'

'না না। উঠে পড়ো চটপট। এই বয়সে আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। চা টোস্ট অমলেট সব বানাও। খাওয়া যাক বসে বসে।'

'আমি বানাব?'

'ক্ষতি কি? অবিশ্যি আমিও বানিয়ে খাওয়াতে পারতাম তোমায়—কিন্তু তাতে যে তোমার উপকার হয়ে যায়। আমি কারও উপকার করব না প্রতিজ্ঞা করেছি না? অতএব, তোমার কোনও উপকার করতেও আমি অক্ষম, বুঝলে?'

কাঞ্চনের জবাবের আগেই গোবর্ধনের আওয়াজ এল পাশের ঘর থেকে।

'দাদা গো দাদা! উঠেছ নাকি? ঘুম ভেঙেছে তোমাদের? চা-জলখাবার সব বানিয়ে টেবিলে সাজিয়ে রেখেছি। মুখটুখ ধুয়ে খেতে বসো না!'

শুনতেই কাঞ্চন বিছানার থেকে তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে। হর্ষবর্ধনও মশারি ভেদ করে বেরোন।

তাঁরা প্রাতরাশের টেবিলে গিয়ে বসার পর গোবর্ধন বলে ঃ 'জান দাদা? কী হয়েছে কাল রাত্তিরে?'

'কাল রাত্তিরে? ঘুমটা খুব তোফা হয়েছে।' তাঁর ছোট্ট জবাব।

'সে আর কবে তোমার না হয়? সে কথা নয়...'

'কী হয়েছে গোবরদা?' কাঞ্চন শুধোয়।

'কী হয়েছে শুনি?' দাদার নিস্পৃহ প্রশ্ন।

'দারুণ এক কাণ্ড হয়ে গেছে পাড়ায়। তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে বলেই টের পাওনি। পাড়াসুদ্ধ সবাই জেগে উঠেছিল। কী সোরগোল পড়েছিল যে!....'

'ধানাই পানাই সাত সতেরো রেখে তোর আসল কথাটা পাড় দেখি।'

'অঘোরে ঘুমোচ্ছ বলে তোমাকে আমি জাগাইনি আর।' গোবর্ধন ভাঙে ঃ 'আমাদের পাড়ায় যা আগুন লেগেছিল কাল! পতিতুণ্ডীদের মুরগিখামারে আগুন লেগেছিল রাত্তিরে। তার ডিমের কারখানা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।'

'আমি তো আগুন লাগাইনি।' হর্ষবর্ধন বলেন। 'কী হে, আমি কি আগুন লাগিয়ে ছিলাম?' পরক্ষণেই তাঁর প্রশ্ন হয় কাঞ্চনকে।

'তুমি লাগিয়েছ কে বলছে? তুমি তো তখন অঘোরে ঘুমুচ্ছ।'

'কি করে লাগল আগুন?' কাঞ্চন শুধায়।

'কে লাগাল?' দাদার জিজ্ঞাসা।

'কে জানে কে লাগিয়েছে! কেউ কি দেখতে গেছে তাকে? অত রাত্রে সবাই তো ঘুমুচ্ছে তখন।'

হর্ষবর্ধন বিস্মিত হন। কে লাগাল আগুনটা? না, তিনি আগুন লাগান নি তাঁর মনে আছে বেশ। লাগাতে তাঁর অনিচ্ছা ছিল না, আপত্তিও নয়, কিন্তু আগুন লাগাবার কথা তাঁর খেয়ালেই আসেনি। তাহলে কে আবার, তাঁর ওপরেও টেক্কা মেরে, বড় দরের এই আরও বেশি অপকারের বাহাদুরিটা করে গেছে?

'সত্যি, আমি ভারী মর্মাহত।' তিনি ব্যক্ত করেন।

'মর্মাহত কেন?' গোবরা অবাক হয়, 'তুমি তো ওই মুরগিদের দু-চোখে দেখতে পারতে না।'

'মর্মাহত আগুনটা আমি লাগাতে পারিনি বলে।' তিনি আপসোস করেন ঃ 'যাকগে, যেই লাগাক, পতিতুণ্ডীদের ঘর-বাড়ি সব পুড়ে খাক হয়ে গেছে তো?'

'তেমন কিছু হয়নি। বেশিদূর গড়ায়নি আগুনটা! খবর পেয়ে দমকলওলারা এসে নিবিয়ে দিয়ে গেছে তক্ষুনি। কেবল মুরগিখামারটাই পুড়ে ছাই হয়েছে।'

'সেও নেহাত কম ক্ষতি হবে না।' হর্ষবর্ধন সান্ত্বনালাভের চেষ্টা পান, 'পতিতুণ্ডী নিশ্চয় বুক চাপড়াচ্ছে খুব।'

'মোটেই না। বরং বেশ হাসি-খুশিই দেখলাম পতিতুণ্ডীবাবুকে। বাড়ি-ঘর সব তো বেঁচে গেছে তাঁর—মুরগিদের খুপরিগুলো পুড়েছে খালি। আর খামারের আটচালার সমস্তটাই, ততটা না হলই, তাহলেও দু-চার হাজারের লোকসান তো বটেই।'

'তবু ভালো!' হাঁফ ছাড়েন দাদা—'সেটাও সুখের কথা।'

'কি করে লাগল আগুন?' কাঞ্চন জানতে চায়।

'আটচালার পাশটাতেই তো ওদের রান্নাঘর। কি করে কুপি উলটে গিয়ে আগুন লেগেছে কে জানে! ওদের উড়ে বামুনের দোষ, বলছে সবাই। গাঁজা খায় তো ব্যাটা, নেশার ঝোঁকে যাবার সময় কুপিটা নিবিয়ে দিয়ে যেতে ভুলে গেছে। তাই এই কাণ্ড হবে হয়তো।'

'বেশ ঘা খেয়েছে পতিতুণ্ডী। কিন্তু তুই যে বলছিস ভারী হাসি-খুশি?'

'কারণটা ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলুম। তা উনি বললেন, ক্ষতি বিশেষ হয়নি, বরং আগুনটা লেগে লাভই হয়েছে বেশ। হাজার দু-তিন টাকার লোকসান হতে পারে কিন্তু খামারটা দশ হাজার টাকায় বীমা করা ছিল কিনা—ওই মোটা টাকাটা মারবেন তিনি এবার।'

'মোটামুটি লাভ তাহলে?' কাঞ্চন বলে।

'হ্যাঁ। পতিতুণ্ডীবাবু বলছেন, ওই টাকাটা পেলে এবার পাকা করে খামার বানাবেন। আরও আরও অনেক মুরগি নিয়ে আসবেন—দেশি বিদেশি নানান জাতের নামজাদা মুরগিদের আনবেন সব। আরও জোর চালাবেন কারবার। বলছেন, আগুনটা লেগে বরাত খুলে গেল আমার।'

'এমন কথা বলছে? অ্যাঁ? হর্ষবর্ধন যেমন হতবাক তেমনিই হতাশ।—মুরগি ব্যাটারা সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তো—না কী?'

'না, বেঁচে গেছে সব কটাই।' গোবরা প্রকাশ করে ঃ 'কী ভাগ্যি দাদা, খুপরিগুলোর ভেতর একটাও মুরগি ছিল না তখন। পতিতুণ্ডী সন্ধেবেলায় ওদের সবাইকে খুপরিতে ভরে খামারের ঝাঁপ বন্ধ করেছিলেন। বেশ মনে আছে ওঁর। কিন্তু কে যে ওদের খুপরি খুলে, আগুন লাগাবার আগটায় ধরে ধরে সব বার করে দিয়েছে, সেই ভারী আশ্চয্যি!'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, মুরগিগুলো মারা পড়লে লোকসান হত সত্যিই! ওগুলো কোনও ইনসিওর করা ছিল না তো।'

হর্ষবর্ধন বলেন—'ছ্যা ছ্যা ছ্যা। এমন কম্মো করে!' এই বলে কাকে ধিক্কার দেন কে জানে!

'পতিতুণ্ডী গিন্নি কী বলছেন জান দাদা?'

'কী বলছেন তিনি?'

গোবর্ধন আরও জানায়—'বলছেন যে ভগবান এসে অবোধ প্রাণীদের বাঁচিয়েছেন। অসহায়দের ভগবান ছাড়া কে আর আছে? অবলাদের তিনিই তো সহায়। ভগবানই এসে বাঁচিয়েছেন ওদের—কোনও পরোপকারীর ছদ্মবেশে এসে। না হলে কি এমনটা হয়? হতে পারে?'

'হ্যাঁ, ভগবানই বটে, নির্ঘাত! ভগবানের গালে মুখে চড় মারতে ইচ্ছে করছে আমার! বলেই না নিজের মুখ-চড়চা করতে যাচ্ছিলেন—হঠাৎ ওঁর মত পালটে যায়। গোবরার কথাটায় তিনি সর্বান্তঃকরণ সায় দেন—'তাই বটেরে গোবরা! ভগবানই বটে। তাঁর কাজই বইকি!'

'আপনিও বলেছেন ভগবানই ওদের খামার থেকে খুলে বার করে দিয়েছে?' কাঞ্চন বলে, বলে একটুখানি মুচকি হাসে।

'কেন নয়? যত্র জীব তত্র শিব। ভগবানই নইতো কী আমি আর? ভগবানই তো।'

'কিন্তু সেও কি সম্ভব দাদা? এই ঘোর কলিযুগে? এখন কি আর ভগবানরা পরের খামারে ঢুকে মুরগি বার করবে? এখন কি এই পৃথিবীতে ওঁদের আর যাতায়াত আছে? তুমি তাই বল?'

'আপনি ভগবান—এই কথা আপনি বলছেন?' কাঞ্চন শুধায়।

'আলবত। আমিও ভগবান। আর, কাঞ্চন, তুমিও একটা বেঁটেখাটো ভগবান—অবিশ্যি যদি তুমি নিজেকে জীব বলে মানতে চাও।'

'মোটেই না। আমি কোন জীবজন্তু নই। আমি মানুষ। আমি কাঞ্চন।' বলে সে নিজের জীব বার করে দেখায় ঃ 'আমি জীব না হলেও আমার কিন্তু একটা জিব আছে। এই দেখুন।'

ভ্যাংচায় কি না কে জানে!

হর্ষবর্ধন তার জিবের দিকে দৃকপাতও করেন না—নির্জীবের মতোই কন—'আমি অবাক হচ্ছি কেন জান? এই পৃথিবীতে মানুষের অপকার করাও কিছু কম কষ্টকর নয়। এখানে উপকার কি অপকার দুই করাই দারুণ দুঃসাধ্য। কাল সারাদিন ধরে কত লোকের কত উপকারের চেষ্টাই না করলাম! ফলে যদ্দূর অপকার হবার

হল—আমার নিজের ক্ষতিও কিছু কম হয়নি। এখনও সারা গায়ে ব্যথা রয়েছে! বেশি ব্যথা অবিশ্যি আমার এই হৃদয়ে।'...উনি নিজের বুকে হাত রাখেন।

'অমৃতাঞ্জন মালিশ করে দেব দাদা?' গোবর্ধন আগ্রহ দেখায়।

'তুই থাম। বুকের ব্যথার তুই কী বুঝিস রে? তারপর ভাই দেখো, কাল শেষটায় যদি বা একজনের অপকার করতে গেলাম, উল্টে ভালো হয়ে গেল তার। যা আমি করতে চাইনি সেই উপকারই হয়ে গেল লোকটার। ওই পতিতুণ্ডীদের কারবার আরও জোরদার করে দিলুম। আরও আরও ওই জাতীয় বজ্জাত মুরগিদের খাওয়া পরা থাকার ব্যবস্থা হয়ে গেল।'

'হিতে বিপরীত? তাই না দাদা!' গোবরা বলে ঃ 'নাকি, বিপরীতে হিত—তুমি তাই বলছ?' কিছু না বুঝেই গোবরা দাদার সাফাই গায়। 'তাই হবে হয়তো। দুনিয়ায় সবই এখন উল্টো পাল্টা দাদা। এক করতে গিয়ে আর হয়ে যায়। বুঝেছ?'

'আরও আরও তাজা ডিম ভাজা খাবে ওরা রোজ রোজ।' বেশ বলে কাঞ্চন।

'হায় হায়!' হায় হায় করেন হর্ষবর্ধন। শেষ কথাটা তাঁর।